মাসের সূচীপত্র।

নূতন তাম্রশাসন প্রবন্ধের ভ্রমসংশোধন।

পৃঃ	পংক্তি	ভ্রম	শুদ্ধ।
৪৮৫	৪	আনিম	আলিম
৪৮৫	১০	আনিম	আলিম
৪৮৬	২১	পবনগতিহরঃ	পবনগতিহয়ঃ
৪৮৮	১০	শ্রীব প্যাটস্ততঃ	শ্রীবপ্যাটস্ততঃ
৪৮৯	৩	যস্মিন্নুদ্দানলীল	যস্মিন্নুদ্দামলীলা
৪৮৯	২০	ধত্তেনাম্বাতৃ সৈন্য ব্যতিকরচকিতো	ধত্তেনাম্বাতৃসৈন্যব্যতিকরচকিতো
৪৯০	৩	সমুদ্রৈঃ	সমদ্রৈঃ
৪৯০	৬	শ্রীকন্যকুব্জ সসলিত চলিত ভ্রূলতালক্ষ	শ্রীকন্যকুব্জসসলিত চলিতভ্রূলতালক্ষ
৪৯০	১০	কর্ণয়ত স্ত্রাপা	কর্ণয়তস্ত্রপা
৪৯০	১০	বিচলিতা নম্রং	বিচলিতান
	১৪	ধূলিধূসরিত	ধূলীধূস
		দেব পাদানুধ্যাতঃ	দেবপা

		ধর্ম্মপাল দেবঃ	ধর্ম্মপালদেব-
	১	শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতি	শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধনভু
		ব্যাঘ্রতটী মণ্ডল সম্বদ্ধ	পাতিব্যাঘ্রতটীম
		মহত্তাপ্রকাশ	সম্বদ্ধমহাপ্রকাশ
	১	কাদম্বরী দেব কুলিকা	কাদম্বরীদেবকুলিকা
৪৯১	১	খর্জ্জূর বৃক্ষশ্চ	খর্জ্জূরবৃক্ষশ্চ
৪৯১	২	পুত্র দেবট কৃতালিঃ	পুত্রদেবটকৃতালিঃ
৪৯১	৯	শাম্ব্রলী নাম	শাম্ব্রলীনাম
৪৯১	১০	গার্দ্ধি শ্রোতিকয়া	গার্দ্ধশ্রোতিকয়া
৪৯১	১০	আম্রযান কোলর্দ্ধ যানিকং	আম্রযানকোলর্দ্ধযানিকং
৪৯১	১১	কালিকা শ্বভ্রঃ	কালিকাশ্বভ্রঃ
৪৯১	১৬	স্থালীককট	স্থালীকট
৪৯২	৮।৯	বম্নূন্ন। নারায়ণ	বম্নূন্ননারায়ণ
৪৯২	১০	পূজোপ স্থানাদি	পূজোপস্থানাদি
৯২	১০	চতুর	চতুরো
৯২	১২	শ্চত্বারো	শ্চত্বারো
২	১৪	ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায়েন	ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন
২	১৫	চন্দ্রার্কক্ষিতি সমকালং	চন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং
৯২	১৬	ভূমের্দানফল গৌরবাদপহরণে	ভূমের্দানফলগৌরবাদপ-হরণে
৯২	২২	ষাষ্টস্বর্ষ	ষষ্টিস্বর্ষ

সূচীপত্র।

Wanting page 1&2

মধ্যে যুক্তি এই;—কারণের গুণে কার্য্যের গুণ গঠিত হয়। পশুহত্যা যদি স্বর্গের কারণ হয় তবে পশুহত্যা যখন যন্ত্রণার কারণ, স্বর্গও তখন যন্ত্রণার কারণ হইবে। কারণে দুঃখ থাকিলে কার্য্যেও দুঃখ থাকিবে।

বলা বাহুল্য যুক্তিটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে। দুঃখ হইতে সুখের উৎপত্তি যে দেখা যায় না এমন নহে। আমরা ঈশ্বরোপাসনায় পশুহত্যার পক্ষপাতী নহি—সে ভিন্নকারণে। এস্থলে কথাটার অবতারণা এইজন্য করা হইল যে, প্রাচীন সাংখ্যেরা যুক্তির মর্য্যাদা রক্ষার জন্য বেদোক্ত আচারকেও দূষণীয় বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

১৪॥ আত্মা ও দীপশিখা॥

নাস্তিকমতে "আত্মা" নামে স্থির বা নিত্যপদার্থ নাই। তাহাদের মতে;—

"স্থিরকার্য্যাসিদ্ধেঃ ক্ষণিকত্বম্" ॥ ১।১।৩৪

—সকল কার্য্যই অস্থির বা অনিত্য—আত্মা একপ্রকার কার্য্য, যেমন দীপশিখা;—অতএব আত্মাও ক্ষণিক। উদাহরণটি নাস্তিকদের বড় প্রিয়। যেমন তৈল ও বর্ত্তিকাতে অন্য দীপশিখার যোগে একটি নূতন দীপশিখার আবির্ভাব হয় তেমনি শুক্রশোণিতে অন্য আত্মার যোগে নূতন আত্মার আবির্ভাব হয়। দীপশিখাকে তোমরা মনে কর উহা স্থির; বাস্তবিক তাহা নহে; উহা ক্ষণে ক্ষণে নবীকৃত হইতেছে। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে দীপশিখা নূতন হইতেছে; উহা ক্ষণিক; কেবল স্থির বলিয়া প্রতীয়মান হয় মাত্র। দীপশিখার ধারাবাহিকতাবশতঃ উহা স্থির বলিয়া মনে হয়—তেমনি কেবল জ্ঞানপ্রবাহের ধারাবাহি-

কতাবশতঃ একটা স্থির আত্মা আছে বলিয়া মনে হয়। সেটা অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রান্তিদর্শনমাত্র।

সাংখ্যেরা এই মত খণ্ডনের জন্য বিস্তর যত্ন করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহাদের যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। উপরোক্ত "স্থির-কার্য্যাসিদ্ধেঃ" সূত্রের উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন ;—

"ন,—প্রত্যভিজ্ঞাবাধাৎ" ॥ ১। ১। ৩৫

—সকল কার্য্যই অস্থির একথা আমরা স্বীকার করি না। তাহা হইলে "প্রত্যভিজ্ঞা"—পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা এখন স্পর্শ করিতেছি এইরূপ জ্ঞান (Identification) অসম্ভব হইত। একমুহূর্ত্তে যে ঘটকে দেখিয়াছি পরমুহূর্ত্তে আর সে ঘট যদি না থাকে—তবে সেই ঘটকে দেখিতেছি বলিয়া জ্ঞান হয় কেন ?

যদি বল তাহা ভ্রমজ্ঞান, তাহা হইলে অন্য আপত্তি আছে ;—

॥ "দৃষ্টান্তাসিদ্ধেশ্চ" ॥ ১। ১। ৩৭

—তোমাদের দীপশিখার দৃষ্টান্ত খাটে না। অগ্রে তোমাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, দীপশিখা যেমন তৈল বর্ত্তিকা প্রভৃতি কারণের কার্য্য তেমনি আত্মাও কোনও কারণ হইতে সমুৎপন্ন হয়। আত্মাকে কার্য্য বলিয়া কেন স্বীকার করিয়া লইব ?

আরো আপত্তির কারণ এই যে, তোমরা যে কার্য্যকারণ-ভাব অঙ্গীকার কর তাহা বস্তুমাত্রেরই ক্ষণিকত্ব মানিলে অসঙ্গত হয়। কেন না—

॥ "যুগপজ্জায়মানয়োঃ ন কার্য্যকারণ ভাবঃ" ॥—১। ১। ৩৮

—দুইটি বস্তু যদি যুগপৎ উৎপন্ন হয় তাহাদের মধ্যে কার্য্য-কারণ ভাব থাকিতে পারে না। কার্য্য হইতে যখন কারণের উৎপত্তি, তখন কারণকে কার্য্যের প্রাক্ক্ষণবর্ত্তী হইতে হইবে। আর যদি বস্তুমাত্রেই ক্ষণধ্বংসি হয় তবে—

॥ "পূর্ব্বাপায়ে উত্তরাযোগাৎ" ॥ ১।১।৩৯

—পূর্ব্বকালবর্ত্তী কারণ ধ্বংস হইলে উত্তরকালবর্ত্তী কার্য্য অসম্ভব হয়। অপিচ কারণস্বরূপ উপাদান ও কার্য্যস্বরূপ উপাদেয়ের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক যে, যখন উপাদেয় আছে তখন উপাদানও আছে,—যখন উপাদান নাই তখন উপাদেয়ও নাই। সুতরাং

"তদভাবে তদযোগাৎ উভয়ব্যভিচারাদপি ন"।—১।১।৪০

—বস্তুর ক্ষণিকত্ব অঙ্গীকার করিলে কারণের সদ্ভাবে কার্য্যের সদ্ভাব ঘটে না—উভয়ের মধ্যে বিরুদ্ধকালবর্ত্তিত্বরূপ ব্যভিচার ঘটে।

যদি বল কারণ কেবল কার্য্যের প্রাক্‌ক্ষণে বর্ত্তমান থাকিয়াই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়,—নিয়ত প্রাক্‌ক্ষণবর্ত্তিত্বই কারণত্ব—উত্তর—

॥ "পূর্ব্বভাবমাত্রে ন নিয়মঃ" ॥ ১।১।৪১

—কেবল নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিত্ব অঙ্গীকার করিলে উপাদান ও নিমিত্তকারণের প্রভেদের কোন নিয়ম থাকে না। আর তর্কস্থলে ইহাও বলা যাইতে পারে—অভাবই সকল কার্য্যের কারণ—কেন না, সকল কার্য্যেরই আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাহার অভাব দেখা যায়। যদি নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেই কারণ হইল তবে অভাব ত সকল কার্য্যেরই পূর্ব্ববর্ত্তী?—

যদি বল—না হয় আত্মাকে কার্য্যই না বলিলাম—কার্য্যকারণের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্, কিন্তু আমরা "বিজ্ঞানবাদ" অর্থাৎ বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও বস্তুর সত্তা অঙ্গীকার করি না; আত্মা কেবল বিজ্ঞানপ্রবাহমাত্র;—তাহার উত্তর এই যে,

॥ "ন বিজ্ঞানমাত্রং বাহ্যপ্রতীতেঃ" ॥ ১।১।৪২

—বিজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নাই এ কথা কিরূপে অঙ্গীকার করা যায়—কেন না, বিজ্ঞানবাহ্য বা বিজ্ঞানব্যতিরিক্ত বস্তুর

"প্রতীতি"—অর্থাৎ সাক্ষাৎকার নামক অনুভব সকলেরই হইয়া থাকে। সকলেই বিজ্ঞানক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে তদতিরিক্ত "জ্ঞ" ও "বিজ্ঞাত" বলিয়া স্বতন্ত্র পদার্থের সাক্ষাৎকার অনুভব করেন। যদি বল তাহা ভ্রম—

"তদভাবে তদভাবাৎ শূন্যং তর্হি।" ১।১।৪৩

—তাহা হইলে প্রতীতিসত্ত্বেও বিজ্ঞানবাহ্য পদার্থের অঙ্গীকার না করিলে বিজ্ঞানেরও অভাব হয়, সংসার সম্পূর্ণ শূন্য হয়। কেন না,

"প্রতীতির্হি বিষয়সাধিকা"—

—প্রতীতির প্রমাণে বিজ্ঞানবাহ্য পদার্থ অঙ্গীকার না করিলে প্রতীতির প্রমাণে বিজ্ঞানকেই বা অঙ্গীকার কেমনে কর?

উপসংহারে বক্তব্য এই যাহারা বলেন—

"শূন্যং তত্ত্বং"— ১।১।৪৪

—না হয় শূন্যকেই তত্ত্ব বা সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিলাম—ক্ষতি কি?—সে কেবল

॥ অপবাদমাত্রমবুদ্ধানাং ॥ ১।১।৪৫

—সে কেবল মূর্খলোকের একটা অসার কথামাত্র।

উভয়পক্ষসমানক্ষেমত্বাদয়মপি ॥ ১।১।৪৬

—বস্তুমাত্রেই ক্ষণিক—বিজ্ঞান ভিন্ন কিছু নাই, এই উভয় পক্ষ প্রত্যভিজ্ঞান ও প্রতীতি দ্বারা যেমন খণ্ডন হয় এই অসার মতও তাদৃশ খণ্ডনীয়।

॥ অপুরুষার্থত্বমুভয়থা ॥ ১।১।৪৭

সংসার শূন্য বলিলে তোমার দুঃখনিবৃত্তিও হইবে না—দুঃখ-

নিবৃত্তির কোনও উপায়ও উদ্ভাবিত হইবে না। এ কথার তর্কে কালহরণ নিষ্ফল।

শাক্যসিংহের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অস্মদ্দেশে উপরোক্ত প্রকার আন্দোলন চলিতেছিল। দেখা যায় এক সম্প্রদায় তার্কিক আত্মাকে দীপশিখার ন্যায় জড়পদার্থের ক্ষণস্থায়ী কার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন—আর এক সম্প্রদায় আত্মাকে কেবল বিজ্ঞানপ্রবাহমাত্র বলিয়া খ্যাপন করেন। কপিল এই উভয় মতই কেবল যুক্তির আশ্রয়ে ভ্রম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যত্নবান হয়েন। তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহা চিন্তাশীল পাঠকবৃন্দের নিজ নিজ বিবেচনা-সাপেক্ষ। দেখা যায় তিনি "প্রতীতি" ও "প্রত্যভিজ্ঞানে"র ভিত্তির উপর আত্মার স্বাধীন অস্তিত্বের প্রখ্যাপক শাস্ত্র গঠন করেন। কিন্তু তাঁহার অনুচরেরা কেহ কেহ অনুমানের দ্বারা আত্মার অস্তিত্বস্থাপনের যত্ন করেন। প্রতীতি এবং প্রত্যভিজ্ঞানের দ্বারা যেমন একদিকে বিজ্ঞানধর্ম্মী আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, তেমনি অপরদিকে অজ্ঞ জড়ের অস্তিত্বও প্রমাণ হয়। কপিলের মতে বিজ্ঞানের চরম সীমায় পৌছিলে প্রতীতি হয় যে,

"জড়প্রকাশযোগাৎ প্রকাশঃ"। ১। ১। ১৪৫

—প্রকাশ, অর্থাৎ বিজ্ঞানের স্ফূর্ত্তিতে প্রকাশাত্মক আত্মা এবং অপ্রকাশাত্মক জড়ের সংযোগ সাধিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাই দর্শনশাস্ত্রের প্রথম সোপান। ইহার উপর আর তর্ক চালাইবার অবসর নাই। ইহার আলোচনা করিলে সংসারকে শূন্য বলিয়া গণ্য করিতে হয়—এবং যাহারা সংসারকে শূন্য বলিয়া জ্ঞান করে তাহারা বাতুল। আর ইহার অপরদিকে দর্শনশাস্ত্রের দৃষ্টি চলে না—সমুদায়ই "অদৃষ্ট"। সেখানেও তর্ক চালাইতে যাওয়া বিফল।

১৫ ॥ অদ্বৈতবাদ ॥

যাঁহারা বলেন সংসারে একমাত্র আত্মা আছে—দ্বিতীয় নাই—সেই "একমেবাদ্বিতীয়ং"বাদীগণকে সাংখ্যেরা বলেন—

॥ জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্ ॥ ১। ১। ১৪৯

—দেখ, জন্ম ও মরণের একটা নিয়ম আছে; যদি আত্মা অদ্বিতীয় হয় তবে এক আত্মার জন্মে সবাই জন্ম অনুভব করে না কেন—এক আত্মার মরণে সবাই মরণ অনুভব করে না কেন? যদি বল—

॥ উপাধিভেদেঽপ্যেকস্য নানাযোগ আকাশস্যেব ঘটাদিভিঃ ॥ ১। ১। ১৫০

উপাধিভেদবশতঃ এক আত্মা বহু বলিয়া প্রতীয়মান হয়—যেমন আকাশ এক হইলেও ঘটস্থ ও পটস্থ বলিয়া মনে হয়; উত্তর এই যে,

উপাধির্ভিদ্যতে নতু তদ্বান্ ॥ ১। ১। ১৫১

—তোমাদের মতে উপাধির ভেদ স্বীকার্য্য, উপাধিমান আত্মার ভেদ স্বীকার্য্য নহে। তাহা হইলে জন্মমরণের কথা ছাড়িয়া সুখদুঃখের কথা কি? সুখদুঃখ আর কি কিছু উপাধির নহে। এক আত্মা সুখ অনুভব করিলে সর্ব্বোপাধিতেই সুখানুভব হয় না কেন—এক আত্মা দুঃখ অনুভব করিলে সর্ব্বোপাধিতেই দুঃখানুভব হয় না কেন? আত্মার একাংশ "বদ্ধ" আর অপর অংশ "মুক্ত"* বলিলে গাঁজাখুরি হয় না কি?

এবমেকত্বেন পরিবর্ত্তমানস্য ন বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসঃ? ১। ১। ১৫২

—এইরূপে সর্ব্বোপাধিতে এক অভিন্ন আত্মা হইলে তাহাতে কি বিরুদ্ধধর্ম্মের আরোপ করা হয় না?—আত্মাকে যদি স্বভাবতঃ

* বদ্ধ = দুঃখজড়িত; মুক্ত = দুঃখপরিশূন্য।

স্বত্ব না বলা যায়, যদি উপাধিযোগই আত্মার বদ্ধভাবের কারণ হয়—তাহা হইলেও আত্মার একদেশে বদ্ধভাব অপরদেশে মুক্তভাব কিরূপে হইবে? আর আত্মা যে তোমাদের মতেও নিত্যমুক্ত বটে—তাহা হইলে একাংশ মুক্ত অপর অংশ বদ্ধ কিরূপ কথা? আত্মার বহুত্ব অঙ্গীকার করিলে এই দোষের পরিহার হয়।

সাংখ্যেরা আরো বলিতে পারিতেন যে, অদ্বৈতবাদমতে আত্মা-ব্যতিরিক্ত আর কোনও বস্তু না থাকায় উপাধিরই বা ভেদ কিরূপ?—অভিন্ন আত্মা ব্যতিরেকে ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত উপাধি থাকিলে আত্মা-ব্যতিরিক্ত অন্য বস্তুরও স্বীকার করা হইল না কি?

ফলতঃ অদ্বৈতবাদ মতটা যে মাথা-পদ-শূন্য তাহা প্রতিপন্ন করিতে অধিক আয়াসের আবশ্যক করে না। অদ্বৈতবাদীরা যুক্তিতে কুলাইতে না পারিয়া শ্রুতিরই দোহাই দেন। কিন্তু তথায় তাঁহাদের অনুসরণ করা অনাবশ্যক, কেন না, সাংখ্যাচার্য্যদের মতে—

॥ বাধিতমর্থং বেদোঽপি ন বোধয়তি ॥

অর্ব্বাচীন সাংখ্যেরা পলায়মান অদ্বৈতবাদীগণের পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া বেদের জঙ্গলেও প্রবিষ্ট হইয়াছেন এবং তথায় শঙ্করের সহিত তাহাদের লাঠালাঠি হইয়াছে। কিন্তু সে বাগযুদ্ধের কাহিনী স্বতন্ত্র। তাহা দর্শনশাস্ত্রের বিষয় নহে।

———

ক

বুদ্ধদেবের জীবনের চারিটি ঘটনা।

একদিন সিদ্ধার্থ যশোধরাকে সঙ্গে লইয়া বসিয়া আছেন এমন সময় চিত্রানাম্নী এক সুন্দরী বয়স্যা তাঁহার সম্মুখে ভিন্ন ভিন্ন দেশের গল্প করিতে লাগিল। সিদ্ধার্থ তাহা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তবে দেখিতেছি আমার রাজভবনের বাহিরে আর এক প্রকাণ্ড জগৎ আছে। তুমি বল দেখি তাহা কি প্রকার? সেখানে কি আমাদিগের মত লোক আছে? তাহারা কি এইরূপে জীবন অতিবাহিত করে? তাহারা কি আমাদিগের মত সৌভাগ্যবান?" কথাবার্ত্তা হইতে হইতে তাঁহার মনে কি একটা উদ্বেগ আসিল। আবার বলিয়া উঠিলেন—"সত্যই কি এই জগৎ আমার রাজভবনের মত? আমি ইহা দেখিতে যাইব। কল্য বেলা দুইপ্রহর হইলে রাজভবনের বহির্দ্দেশে কি কি দৃশ্য আছে আমি সকলই দেখিব। ছন্দককে আমার রথ প্রস্তুত করিয়া রাখিতে বলিও।"

এই কথা শুদ্ধোদনের কর্ণে প্রবেশ করিলে তিনি চারিদিকে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, সিদ্ধার্থ কল্য দুইপ্রহর বেলায় নগর দেখিতে বাহির হইবেন। প্রজারা যেন তাহাদিগের গৃহ বিধিমত পরিচ্ছন্ন রাখে এবং অন্ধ বা কুব্জ বা খঞ্জ বা বৃদ্ধ বা কুষ্ঠরোগাক্রান্ত কোন ব্যক্তি যেন সেই সময়ে রাজকুমারের দৃষ্টিপথে না পড়ে।

পরদিন সিদ্ধার্থ চতুরশ্বসংযোজিত বিবিধবর্ণবিভূষিত এক রথে আরোহণ করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। প্রজারা মহোল্লাসে নিজ নিজ গৃহ সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল। সিদ্ধার্থকে দেখিয়া তাহারা সকলেই রথের পশ্চাৎবর্ত্তী হইল।

তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল, কেহ কেহ অশ্বের মুখধারণ করিয়া চলিতে লাগিল, কেহ কেহ ধান্য দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল এবং চারিদিক হইতে জয়-ধ্বনি উত্থিত হইল। কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিতে পারে? এত আনন্দের ভিতরে, এত জনরবের মধ্যে হঠাৎ এক ঘৃণিত পদার্থ সিদ্ধার্থের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। একজন পলিতকেশ দন্ত-বিহীন কুব্জ অন্ধ বৃদ্ধ যষ্টিধারণ করিয়া রাজকুমারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল—"ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও, প্রাণ যায়!" ছন্দক তাহাকে তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সিদ্ধার্থ বারণ করিলেন। অনেক ক্ষণ তাহাকে দেখিতে দেখিতে কিছু বুঝিতে না পারিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছন্দক, এ জীবটি কি? এ কি মানুষ? মানুষের চক্ষু কর্ণ ইহার সবই আছে। ইহা কথাও কহিতেছে। অথচ মানুষ ত সচরাচর এরূপ হয় না।" ছন্দক বলিল—"মহারাজ, এটি বৃদ্ধ। সত্তর আশী বৎসর পূর্ব্বে ইহা ঠিক আমাদিগেরই মত ছিল। কিন্তু এখন ইহা বার্দ্ধক্যবশতঃ ক্ষীণ-কায় ও অকর্ম্মণ্য হইয়াছে।" সিদ্ধার্থ বলিলেন—"আচ্ছা, এই বার্দ্ধক্য কি কেবল ইহারই হইয়াছে, না সকলেরই হইবে? ছন্দক বলিল—"মহারাজ, ইহা সকলেরই অদৃষ্টে আছে।" "আচ্ছা, আমি যদি অনেকদিন জীবিত থাকি আমারও এইরূপ হইবে? যশোধরারও এই দশা হইবে? জালিনী, হস্তা, গোতমী, গঙ্গা ও অন্যান্য সকলেরও এই বার্দ্ধক্য আসিবে?" "মহারাজ, সকলেরই এই অবস্থা আসিবে।" ছন্দকের এই কথা শুনিয়া সিদ্ধার্থ হতবুদ্ধি হইয়া ক্ষণকাল পরে বলিলেন—"ছন্দক, রথ ফিরাইয়া লও। গৃহাভিমুখে চল। যাহা দেখিলাম তাহা অদ্য-কার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে।"

সিদ্ধার্থ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ঘোর মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। যশোধরা তাঁহাকে এতদবস্থায় দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিলেন—"তুমি কেন এরূপ মৌন অবলম্বন করিয়া আছ? আমাকে দেখিতে কি ভাল লাগিতেছে না?" সিদ্ধার্থ বলিলেন—"যশোধরা, তোমাকে দেখিলে আমার হৃদয় প্রেমানন্দে বিগলিত হয়। কিন্তু আজ সে আনন্দ দুঃখে পরিণত হইয়াছে। নগরে গিয়া শিখিয়া আসিলাম যে, তোমার সৌন্দর্য্য ও আমার এই যৌবন উভয়ের কোনটাই থাকিবে না। বার্দ্ধক্য আসিয়া আমাদিগের দুইজনকেই গ্রাস করিবে।" সিদ্ধার্থের সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না।

আর একদিন সিদ্ধার্থ বাগানে যাইতে যাইতে নগরের আর এক দ্বারে উৎকটরোগাক্রান্ত একজন মানুষকে দেখিতে পাইলেন। সে রাস্তার একপার্শ্বে পড়িয়া ছিল। তাহার শরীর ব্যাধিজর্জ্জরিত। নিরন্তর উঠিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। সিদ্ধার্থ দয়ার্দ্র হইয়া তাহার নিকট গিয়া তাহাকে উঠাইয়া দিলেন। তৎপরে ছন্দককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছন্দক, ইহার কি হইয়াছে? ইহা এরূপ করিতেছে কেন?" ছন্দক বলিল—"মহারাজ, ইহাকে স্পর্শ করিবেন না। ইহার উৎকট পীড়া হইয়াছে।" সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন—"পীড়া কি সকল লোকেরই হয়?" ছন্দক বলিল—"হাঁ মহারাজ।" সিদ্ধার্থ বলিলেন—"তবে কোন লোকই নিশ্চিন্ত হইয়া প্রাণধারণ করে না। ছন্দক, আজ যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে। রথ ফিরাইয়া লও।"

এখনও সিদ্ধার্থের শিক্ষার শেষ হয় নাই। আর একদিন তিনি বাগানে যাইতেছিলেন এমন সময় নগরের দ্বারে এক

মৃতদেহ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি দেখিলেন যে, কতক-গুলি নরনারী রোদন করিতে করিতে রাস্তা দিয়া যাইতেছে। তাহাদিগের মধ্যে একজন মৃৎপাত্রে অগ্নি লইয়া যাইতেছে এবং পার্শ্বে চারিজন লোক স্কন্ধোপরি শবধারণ করিয়া চলিয়াছে। কুটুম্বেরা উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছে। শবের বিকটাকার মূর্ত্তি দেখিয়া সিদ্ধার্থের মনে যুগপৎ ভয় ও ঘৃণা হইল। ছন্দককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কি?" ছন্দক বলিল— "মহারাজ, ইহা একটি মৃতলোকের দেহ। ইহার পরমায়ুর শেষ হইয়াছিল। এখন জীবনযাত্রা শেষ করিয়া দেহত্যাগ করি-য়াছে।" সিদ্ধার্থ বলিলেন—"কি? ইহা মানুষ ছিল, এখন আর মানুষ নাই? সকল লোকের কি এইরূপ হয়, না ইহারই কেবল হইয়াছে?" ছন্দক বলিল—"মহারাজ, সকল লোকেরই কপালে মৃত্যু আছে।" সিদ্ধার্থ বলিলেন—"আমিও তবে এক সময়ে মৃত্যুর গ্রাসে পড়িব?" ছন্দক বলিল—"হাঁ মহারাজ।" সিদ্ধার্থের হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিলেন।

শুদ্ধোদন এইসকল সংবাদ পাইয়া অতিশয় ভীত হইলেন। পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য দ্বিগুণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজভবনের চতুর্দ্দিকে প্রহরীসংখ্যা বর্দ্ধিত করিলেন। কিন্তু বিধাতার সহিত তিনি কতদিন এইরূপ সংগ্রাম করিবেন? চতুর্থ দিনে সিদ্ধার্থ নগরের অবশিষ্ট দ্বারে একজন সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন। সন্ন্যাসীর কলেবর ভস্মাবৃত; তাহার মুখ স্থির ও গম্ভীর; হস্তে কমণ্ডলু; পরিধানে একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্ম। দেখিলেই বোধ হয় তাহার ভয় নাই চিন্তা নাই কামনা নাই; শান্ত দান্ত সমাহিতচিত্ত হইয়া সে নিশ্চিন্তহৃদয়ে নগরের পথে

বিচরণ করিতেছে। সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছন্দক এটি কে?" ছন্দক বলিল—"মহারাজ, ইনি সন্ন্যাসী। সংসারের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইনি মায়াপাশ ছেদন করিয়াছেন।" সিদ্ধার্থ বলিলেন—"এই লোকই প্রকৃত জ্ঞানী। যেহেতু সংসারে কেবল দুঃখ এই জানিয়া ইনি সকলই পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাস্তবিক এখানে থাকিয়া দুঃখভোগ করা কি যন্ত্রণাদায়ক! সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া জীবনযাপন করিলেই প্রকৃত শান্তি পাওয়া যায়। ছন্দক, রথ ফিরাইয়া লও।"

সে দিবস দিবাভাগ তিনি বাগানেই অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার সে স্ফূর্ত্তি ছিল না। স্নানাহার হইলে তিনি বৃক্ষতলে এক প্রশস্ত প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। অবশেষে বেশভূষা করিবার সময় আসিল। যত বিচিত্রবর্ণ উৎকৃষ্ট বস্ত্র ছিল পরিচারিকারা তাঁহার নিকট তাহা লইয়া উপস্থিত করিল। বিবিধ অলঙ্কার, সুবাসিত তৈল, সুগন্ধ দ্রব্যাদি তাঁহার চতুর্দ্দিকে সজ্জিত হইল। বেশভূষা সমাপ্ত হইলে বিবিধ গায়ক গায়িকা নর্ত্তকীরা আসিয়া তাঁহাকে সুললিত সঙ্গীত ও নৃত্য দ্বারা মোহিত করিতে চেষ্টা করিল। অবশেষে রথ প্রস্তুত হইল। তিনি তাহাতে পদক্ষেপ করিয়াছেন এমন সময় দ্রুতবেগে একজন দূত আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, শুভক্ষণে নিরাপদে যশোধরা এক পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন। অন্য কোন সময়ে এ সংবাদ আসিলে সিদ্ধার্থের আনন্দের সীমা থাকিত না। কিন্তু সে দিন তিনি চিন্তাকুল ছিলেন। সংসার অনিত্য, দুঃখের নিবাস ইহা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার হৃদয় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি আর কিছুতেই সুখী হইতে পারিতেছেন না। এমন শুভঘটনা হইয়াছে, তিনি

তাহাতেও কিছুই আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন না। কেবল বলিয়া উঠিলেন—"হায়! এই পুত্র আমার পক্ষে আর একটি শৃঙ্খল-স্বরূপ হইল। আরও সংসারে বদ্ধ হইলাম। কিন্তু এ শৃঙ্খলটিকেও ভাঙ্গিতে হইবে!" তিনি আর কিছু না বলিয়া দূতকে কেবল এইমাত্র বলিলেন—"তুমি পিতাকে গিয়া এই নিবেদন কর যে, আমার পুত্রের নাম রহুল হইল।"

তাহার পর তিনি রথারোহণ করিয়া কপিলবস্তু নগরাভি-মুখে যাত্রা করিলেন। প্রজারা আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল এবং চারিদিকে মহা কলরব উঠিল। পথে যাইতে যাইতে কৃষ্ণা গৌতমী নাম্নী একজন সম্ভ্রান্তা মহিলা সিদ্ধার্থকে দেখিয়া উচ্চৈঃ-স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"যে পিতামাতার এমন অদ্বিতীয় সন্তান তাহারা সুখী, যে পত্নী এমন সর্ব্বগুণে বিভূষিত স্বামী পাইয়াছে সেও ধন্য।" সিদ্ধার্থ একথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। চিন্তাশীল হৃদয়ে একটি কথা প্রবেশ করিলে তখনই তাহার ভাবার্থ করিয়া লয়। সিদ্ধার্থ "সুখী" ও "ধন্য" এই দুইটি কথার অর্থ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল যে, রিপুদল হইতে মুক্ত হইলেই লোকে সুখী হয় এবং তাহা হইলেই পিতামাতা এবং পত্নীও ধন্য হয়। কৃষ্ণা গৌতমী এই ভাবটি মনে আসিবার পক্ষে অনুকূলা হইয়াছিলেন বলিয়া সিদ্ধার্থ একটি মুক্তাহার গলা হইতে খুলিয়া তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণা তাহা পাইয়া সগর্ব্বে মনে করিলেন যে, সিদ্ধার্থ বুঝি তাঁহার রূপে মোহিত হইয়া এই অলঙ্কারটি দান করিয়াছেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ তাঁহার প্রতি দৃক্‌পাতও না করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। *

* সিদ্ধার্থ যে চারিটি দৃশ্য দেখিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে একটি চমৎকার ইতিহাস আছে। বৌদ্ধদিগের মধ্যে এ ব্যাপারটি নানা রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া কাব্য ও ধর্ম্ম-

বুদ্ধদেবের সন্ন্যাস।

কি আশ্চর্য্য! শুদ্ধোদন যে যে উপায় দ্বারা সিদ্ধার্থকে সংসারে বদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই সেই উপায়

শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু গল্পের গতি কে রোধ করিতে পারে? কোন গল্প যদি ভাল হয় তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে পৃথিবীময় ছাইয়া পড়ে। সিদ্ধার্থ-বিষয়ক গল্প সম্বন্ধেও এইরূপ হইয়াছে। খ্রীঃ অব্দের অষ্টম শতাব্দীতে খালিফ আলমানসুর বলিয়া এক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি বাগদাদ্ নগরে রাজত্ব করিতেন। সেই সময়ে মুসলমানেরা তাহাদিগের নবধর্ম্মে উৎসাহিত হইয়া পৃথিবীর চারিদিকে সভ্যতার আলোক বিস্তার করিয়াছিল। তখন ইউরোপ ঘোর অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন। বাগদাদ্ নগরে অনেকগুলি পণ্ডিত বাস করিতেন। তাঁহারা পুস্তক রচনা করিয়া, বিশেষতঃ পুরাকালের নানাদেশীয় সাহিত্য অনুবাদ করিয়া পুনর্ব্বার ইউরোপে বিদ্যার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ভারতবর্ষের নিকট তাঁহারা অধিক পরিমাণে ঋণী ছিলেন। গণিত, জ্যোতিষ, দর্শন, চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রভৃতি তাঁহারা ভারত হইতে লইয়া ইউরোপ ও ইসলামকে দান করেন। আবদল্লা আল্ মোকার্ফা বলিয়া একজন পণ্ডিত কর্ত্তৃক পঞ্চতন্ত্র অনুবাদিত হয়, এবং সার্গিয়াস্ বলিয়া একজন খ্রীষ্টান পণ্ডিত "বার্লাম ও জোসার্ফাৎ" নামে এক গল্প রচনা করেন। পঞ্চতন্ত্র পারসীক ভাষা হইতে অনুবাদিত হইয়াছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যদেশে খসরু নুসির্ব্বান বলিয়া একজন প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। তিনি কোথা হইতে শুনিয়াছিলেন যে, ভারতে এমন সকল লতা ও বৃক্ষমূল পাওয়া যায় যাহার রস পান করিলে মৃতদেহে পুনরায় জীবন সঞ্চারিত হয়। সম্রাট ঐ সকল লতা ও বৃক্ষমূল আহরণ করিবার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করাতে বার্জ্জুয়ে বলিয়া একজন ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ভারতে প্রেরিত হইলেন। বার্জ্জুয়ে এদেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে জানিতে পারিলেন যে, যে সকল লতা ও বৃক্ষমূলের কথা সম্রাট শুনিয়াছিলেন তাহা রূপকমাত্র। ভারতে এরূপ জ্ঞানগর্ভ পুস্তক আছে যাহা পাঠ করিলে পাপীরা অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হয়। এই রহস্য শুনিয়া বার্জ্জুয়ে যত্নের সহিত সংস্কৃত গ্রন্থসকল সংগ্রহ করিয়া পারস্যে ফিরিয়া গেলেন এবং তথায় সেইগুলি পারসীক ভাষায় অনুবাদ করিলেন। সেই সকল পুস্তকের মধ্যে পঞ্চতন্ত্র একখানি। এই পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলি আজ ইউরোপের বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যপুস্তক। ইউরোপীয়েরা কেহই জানেন না যে, সেই গল্পগুলির জন্মস্থান ভারতবর্ষ। সার্গিয়াস যে পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন তাহার নাম "বার্লাম ও জোসার্ফাৎ"। জোসাফাৎ বুদ্ধদেবের নামান্তর মাত্র। তিনিও রাজপুত্র, বৈরাগ্যতৎপর ছিলেন। তাঁহাকেও তাঁহার

সংসারশৃঙ্খল ভগ্ন করিবার প্রধান অস্ত্র হইল। তাঁহার ইচ্ছা যাহা ছিল, ঠিক তাহার বিপরীতটি ঘটিল। তাঁহার বাসনা ছিল সিদ্ধার্থ রাজরাজেন্দ্র হইয়া পৃথিবীকে শাসন করিবেন, এবং সেই বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি তাঁহাকে ইন্দ্রিয়সুখে নিমগ্ন রাখিয়াছিলেন। তিনি ইহা বিবেচনা করেন নাই যে, পৃথিবীর অধিপতি হইতে হইলেও অসাধারণ বীরত্ব, ধৈর্য্য, ত্যাগস্বীকার এবং সহিষ্ণুতার আবশ্যক হয়। সে সকল গুণ বিলাসের মধ্য হইতে কিরূপে বিকশিত হইবে? মনুষ্যহৃদয়ে বৈরাগ্য অনেক প্রকারে আসিতে পারে। কেহ কেহ মৃত্যু দেখিয়া সংসারমায়া ত্যাগ করে, কেহ বা দুঃখযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বৈরাগী হয়। শুদ্ধোদন তাঁহার পুত্রকে দুঃখ সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ রাখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? একবার নগরের পথ দিয়া গমন করিলেই যে, দুঃখ জরা মৃত্যুর পরিচয় পাওয়া যায়। যাহারা এইসকল দিবারাত্র দেখিতেছে তাহারা বার্দ্ধক্য বা পীড়া বা মৃত্যু দেখিয়া বিচলিত হয় না। কিন্তু সিদ্ধার্থ দুঃখ কাহাকে বলে তাহা

পিতা রাজভবনে বদ্ধ রাখিয়াছিলেন এবং তিনিও চারিটি দৃশ্য দেখেন। সার্গিয়াস্ এই গল্পটি ভারত হইতে লইয়া খ্রীষ্টীয় বেশে য়ুরোপে প্রচারিত করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টানেরা গল্পটিকে বাস্তবিক একজন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী রাজকুমারের আখ্যায়িকা বিশ্বাস করিয়া জোসাফাৎকে সাধু (saint) পদে অভিষিক্ত করিয়াছে এবং আজ পর্য্যন্ত এই সাধুর অর্চ্চনার জন্য নির্দ্ধারিত দিবস রোমান ক্যাথলিক পঞ্জিকায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। বুদ্ধের অদৃষ্ট ভাল। তাঁহার প্রকৃত উপাসকদিগের সংখ্যা অন্যান্য সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অপেক্ষা অধিক। আবার হিন্দুরা তাঁহাকে দশ অবতারের মধ্যে এক অবতার বলিয়া গণ্য করে। এখন দেখা যাইতেছে যে, খ্রীষ্টানেরাও তাঁহাকে সাধুপদ দিয়া নির্দ্দিষ্ট দিবসে তাঁহার অর্চ্চনা করে। ভট্ট ম্যাক্স্‌মূলর এই সম্বন্ধে "Migration of fables" বলিয়া একটি উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ রচনা করিয়াছেন। পাঠকেরা তাহা মনোযোগের সহিত পাঠ করেন ইহাই আমার অনুরোধ।

জানিতেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন পৃথিবীতে হাস্যমুখ ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল তিনি যে সকল সুখ উপভোগ করিতেন তাহা চিরকালই থাকিবে। সুতরাং যখন তিনি দুঃখের দৃশ্য দেখিলেন, যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইহসংসারের সকলই অসার, সকলই অনিত্য, সকলই ক্ষণ-ভঙ্গুর, তখন তাঁহার মনে যে বিতৃষ্ণা ঘৃণা ও বৈরাগ্য আসিল তাহা কি কেহ অপনোদন করিতে পারিল? কোন প্রকার আতি-শয্য ভাল নহে। এই আতিশয্যের ফল শুদ্ধোদন নিজ পুত্রের জীবনেই প্রাপ্ত হইলেন।

যে দিবস সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসীকে দেখিয়া নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করি-লেন সেই দিবস রাত্রে তাঁহার গৃহে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান দ্বিগুণ-রূপে হইয়াছিল। যে সকল সুন্দরী যুবতীরা নৃত্যগীত করিতেছিল তাহারা প্রাণপণে তাঁহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছিল। যদি তাঁহার মন স্বভাবতঃ কামুক হইত তাহা হইলে বোধ হয় সেই রাত্রে তিনি সংসারের দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে চিরকালের জন্য আবদ্ধ হইয়া থাকিতেন। কিন্তু আতিশয্যে বিপরীত ফল উৎপন্ন হয়। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। নর্ত্তকীরা যত তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিল ততই তাঁহার হৃদয় সংসার হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। চতুর্দ্দিকের সেই আনন্দধ্বনি তাঁহাকে বধির করিয়া ফেলিল; সুন্দর বেশভূষা, সুন্দরীর মধুর দৃষ্টি তাঁহাকে অন্ধ করিয়া ফেলিল। তিনি কিছুই শুনিতে পাইলেন না, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। শ্রান্তি আসিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তিনি নিদ্রা-মগ্ন হইলেন। গায়িকা ও নর্ত্তকীরাও তাঁহাকে নিদ্রায় অভি-ভূত দেখিয়া নৃত্যগীত পরিত্যাগপূর্ব্বক নিদ্রাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিল।

অৰ্দ্ধরাত্রে সিদ্ধার্থের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন তিনি কি দেখিলেন? যুবতীরা যে রূপ ধারণ করিয়া নৃত্যগীত করিতেছিল, সে রূপ ত আর নাই! তাহারা কত উপায়ে কত বিচিত্র রঙ্গে মুখ রঞ্জিত করিয়াছিল, সে রঙ কোথায় গেল? তাহাদিগের বেশবিন্যাস আর ছিল না। আলুলায়িত কেশে তাহারা ভূমিতে পড়িয়া ছিল—সহজে তাহাদিগকে চিনিতে পারা যায় না। কাহারও নাসারন্ধ্র হইতে বিকট শব্দ নির্গত হইতেছে; কাহারও মুখ হইতে লাল পড়িতেছে; কেহ মুখব্যাদান করিয়া আছে; কেহ বা দাঁত কড়মড় করিতেছে; কেহ স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে অসংলগ্ন বাক্য উচ্চারণ করিতেছে; কেহ বা অৰ্দ্ধবিবস্ত্রা হইয়া কুৎসিৎ ভাবে পড়িয়া আছে; কেহ বা পদদ্বয় উন্নমিত করিয়া শয়ন করিয়া আছে; কেহ বা এক পদ অন্যের উপর চাপাইয়া পড়িয়া আছে। যাহার যাহা অঙ্গের দোষ লুক্কায়িত ছিল তাহা শয়নাবস্থায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্ত দেখিয়া সিদ্ধার্থের মনে বীভৎস রসের উদয় হইল। তাঁহার মনে হইল যেন তিনি এক শ্মশানে পড়িয়া আছেন এবং চারিদিকে বিকটাকার শব ঘেরিয়া আছে। তিনি ভাবিলেন, "হায়! আমি বিপদের মধ্যে পড়িয়া আছি! দুঃখ কষ্ট আমার চারিদিকে! এস্থান হইতে রক্ষা পাইব কি রূপে!" তখন এক অনির্ব্বচনীয় ভাব আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিল। আর তিনি সংসারের কীট হইয়া থাকিবেন না। "আজ রাত্রে, এই মুহূর্ত্তেই আমি সংসার হইতে বিদায় লইয়া মহাতীর্থে যাত্রা করিব।" এই বলিয়া তিনি দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া ছন্দককে উঠাইয়া দিলেন এবং বলিলেন—"আমি এখনই রাজভবন হইতে বহির্গত হইব। তুমি শীঘ্র আমার অশ্ব কণ্টককে আনয়ন করিতে বল।" তাহার পর তাঁহার মনে হইল

যে, একবার নবজাত পুত্রের মুখাবলোকন করা উচিত। এই ভাবিয়া তিনি নিঃশব্দে যশোধরার শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তথায় দেখিলেন যে, যশোধরা নবজাত পুত্রের মস্তকে হস্ত রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। সিদ্ধার্থের মনে হইল যে, যদি পুত্রকে আলিঙ্গন করিতে যাই তাহা হইলে যশোধরার নিদ্রাভঙ্গ হইবে এবং তাঁহার সমুদায় অভিপ্রায় ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অতএব দূরে থাকিয়া তাহাকে অবলোকন করাই শ্রেয়ঃ। ক্ষণকাল গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া অবশেষে তিনি যশোধরাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন। ইহা তাঁহার শেষ বিদায় হইল। নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়াছিলেন, নিঃশব্দে ঘরের বাহিরে আসিলেন। সেই দ্বি-প্রহর রজনীতে তিনি এবং ছন্দক দুইজনে কেবল জাগ্রত ছিলেন। দ্বাররক্ষকেরা নিদ্রায় অভিভূত। ধীরে ধীরে তিনি দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন কণ্টক প্রস্তুত। দ্বার খুলিতে বহু আয়াস করিতে হইল না। যেন দৈববলে আপনা হইতে দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। আর অধিক না ভাবিয়া তিনি অশ্বারোহণ করিলেন। ছন্দক তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইল।

ক্রমে কপিলবস্তুর উন্নত প্রাসাদশ্রেণী ও বিস্তৃত রাজমার্গ পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে নগরের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার জীবনের একটি গর্ভাঙ্ক শেষ হইল এবং আর একটির আরম্ভ হইল। ঊনত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রমে ৯৭ অঞ্জনাব্দে আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা-তিথিতে তিনি রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া কঠোর বৈরাগ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। *

---

* সিদ্ধার্থ কপিলবস্তু জন্মের মত ত্যাগ করিলেন। বুদ্ধপদ প্রাপ্ত হইবার পর তিনি পিতার রাজধানীতে আবার আসিয়াছিলেন। কিন্তু কপিলবস্তুর

বৈজ্ঞানিক সংবাদ।

সব্যসাচী। ডাইনে বাঁয়ে ভেদজ্ঞান বোধ করি জীবের মধ্যে একমাত্র মানুষেরই আছে। জ্ঞান যে, মনুষ্যের চিরকাল ছিল তাহা নহে। পূর্ব্বে, মানবজাতির আদিম অবস্থায় দুই হাতের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না বলিয়া অনুমান করা যায়।

পরমায়ু আর অধিক কাল ছিল না। ঠিক কোন সময়ে এই নগর ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তাহা জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই। শাক্যবংশের উচ্ছেদ-বিবরণ আমরা পরে লিখিব। কিন্তু শাক্য-নগর ঠিক তাহাদিগের সঙ্গে লোপ পাইয়াছিল কি না সে বিষয় মীমাংসা করিবার আপাততঃ কোন উপায় নাই। যখন খ্রীঃ অব্দের পঞ্চম শতাব্দীতে ফাহিয়ান নামক চীন পর্য্যটক ভারতে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তিনি কপিলবস্তুকে ভগ্নাবস্থায় দেখিয়া যান। সপ্তম শতাব্দীতে আর একজন চীন পর্য্যটক (হাইউন সাং) উক্ত নগরের একটি বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার লেখার একাংশ আমরা অনুবাদ করিতেছি। তিনি বলেন—"কপিলবস্তু রাজ্যের বিস্তৃতি প্রায় ৩০০ ক্রোশ। ইহার অন্তর্গত দশটি নগর পরিত্যক্ত অবস্থায় রহিয়াছে। তাহাদিগকে দেখিলে মনে ভয় হয়। রাজধানীর ভগ্নাবশেষমাত্র আছে। ইহার কত পরিধি ছিল তাহা এখন কোনমতে স্থির করা যায় না। রাজভবন রাজধানীর ভিতর; ইহার বিস্তৃতি এক ক্রোশের অধিক ছিল। গৃহের পত্তন এখনও উচ্চ ও জমাট দেখা যায়। অনেক শত বৎসর পূর্ব্বে ইহাকে লোকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। গ্রামগুলিতে এখনও কথঞ্চিৎ পরিমাণে বসতি আছে। তাহাদিগের কেহ রাজা নাই; প্রতিগ্রামে এক একজন অধিকারী আছে। এখানকার ভূমি যথেষ্ট উর্ব্বরা, ফসল যথা সময়ে হয়। লোকেরা ভদ্র এবং সভ্য। পূর্ব্বে এখানে অন্যূন সহস্র বিহার ছিল। তাহাদিগের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। রাজভবনের পার্শ্বে এখনও একটি বিহার আছে। তাহার মধ্যে ৩০ জন ভিক্ষু অবস্থিতি করিতেছে।" হাইউন সাং যে উৎকৃষ্ট বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে আমরা অনেকগুলি নূতন কথা পাই। সিদ্ধার্থ যখন যেস্থানে যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার স্মরণার্থে সেই স্থানে একটি স্তূপ কিম্বা বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল। একটি বিহারে শুদ্ধোদন রাজার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। যেখানে মায়াদেবীর শয়নমন্দির ছিল সেইখানে আর একটি বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাতে মায়াদেবীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যাইত। যেখানে সিদ্ধার্থ মায়ার গর্ভে প্রবেশ করেন, যেখানে অসিত মুনি তাঁহার জীবন গণনা

হঠাৎ এরূপ একটা তত্ত্ব অনুমান করিয়া বসাতে কেহ আপত্তি প্রকাশ করিতে পারেন এবং তিনি খুব সম্ভব আরও আশ্চর্য্য হইবেন যদি বলা যায় যে, বৈজ্ঞানিকেরা আদিম মানবের দুই হাতে সমানভাবে চিত্রাঙ্কণ-ক্ষমতা দেখিয়াই এরূপ অনুমান করিয়াছেন।

লক্ষাধানেক বৎসর পূর্ব্বের চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে এরূপ স্থির করিয়া ফেলাটা কিছু দুঃসাহসের কার্য্য সন্দেহ নাই, সেইজন্য আমরা কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছি।

সকলেই জানেন যে, মেমথ্ নামক প্রকাণ্ড হস্তিজাতীয় জন্তু ন্যূনাধিক ৮০০০০ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে বিচরণ করিত। সুতরাং যদি লোকালয়বিহীন সাইবীরিয়ার নির্জ্জন প্রদেশে, মাটি খুঁড়িয়া একটি চিত্রাঙ্কিত মেমথ্দন্ত পাওয়া যায় তাহা হইলে চিত্রকর যে সেই কালেরই লোক তাহা ভরসা করিয়া বলা যায়।

তবে কোন্ হাতে আঁকা হইয়াছে এ বিষয়টার মীমাংসা আবশ্যক। পাঠক যদি একটি মনুষ্যের পার্শ্বের মুখ আঁকিবার চেষ্টা করেন এবং যদি আর্ট-ইস্কুলে শিক্ষা করিয়া তিনি হাতের স্বাভাবিক গতিকে চাপা না দিয়া থাকেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, তিনি স্বভাবতই সেই মুখের নাক বাম দিকে আঁকিবেন এবং যদি বাম হাত দিয়া উক্ত কার্য্য করেন তাহা হইলে নাক

করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি বুদ্ধ হইবেন, যেখানে তিনি স্বয়ম্বরোপলক্ষে শরনিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে বৌদ্ধেরা একটি একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত নগরের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম দ্বারে চারিটি বিহার ছিল। এই সকল দ্বার দিয়া গমন করিবার সময় তিনি বার্দ্ধক্য জরা মৃত্যু এবং সন্ন্যাসের চারি মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। প্রতি বিহারে একটি বৃদ্ধ, একটি রোগী, একটি মৃতব্যক্তি এবং একটি সন্ন্যাসীর প্রতিমূর্ত্তি ক্ষোদিত ছিল।

ডান দিকে আসিয়া পড়িবে। হাতের গঠনের দরুণই এরূপ আঁকাটাই সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা যে কালের কথা বলিতেছিলাম, সেকালের প্রস্তর অস্থিখণ্ড প্রভৃতির উপর অঙ্কিত অনেকগুলি চিত্র যদি সংগ্রহ করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, কতকগুলি দক্ষিণদিকে আঁকা—কতকগুলি বামদিকে আঁকা; কোন দিকের বিশেষ প্রাধান্য নাই। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, ছবি-আঁকা প্রভৃতি সূক্ষ্মকার্য্য-সকলের নিমিত্ত কোন বিশেষ হস্ত নিযুক্ত ছিল না।

পার্থক্য যদি নাই ছিল তাহা হইলে পরে কিরূপে জন্মাইল? এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে গেলে সেকালের সমাজের রীতি-নীতির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করা আবশ্যক হইবে। দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সেকালের আচারব্যবহার কিছু রূঢ় রকমের ছিল। তখনকার বসন্ত-আগমনে যখন যুবকের হৃদয়ে প্রেমানল জ্বলিয়া উঠিত তখন সে নিষ্ফল হাহুতাশে তাহা ব্যয় করিত না—সে ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া থাকিত এবং যখন তাহার হৃদয়েশ্বরী সেই স্থান দিয়া যাইত, তখন যুবক তাহাকে লাঠির বাড়ি পাড়িয়া ফেলিয়া চুল ধরিয়া তাহার গুহায় হিঁচড়াইয়া লইয়া যাইত। যদি দুর্ভাগ্য-বশতঃ কোন একটি সুন্দরীর রূপ দুইটি যুবাকে মুগ্ধ করিত তাহা হইলে তাহারা উন্মত্ত পশুর ন্যায় স্ব স্ব অধিকার স্থির করিবার নিমিত্ত লড়িত এবং যে জয়লাভ করিত সে তাহার যুদ্ধ-লব্ধ নববধূকে লইয়া পরম তৃপ্তির সহিত তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভক্ষণ করিয়া বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন করিত।

যে কালের বিবাহ-প্রথা এইরূপ সেকালে যে, কথায় কথায় মারামারি লাঠালাঠি চলিত তাহা সহজেই বিশ্বাস হয়। যুদ্ধের সময় স্বভাবতই এক হাত আক্রমণ-কার্য্যে এবং অপর হাত

রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। এবং বামদিকস্থিত হৃৎপিণ্ড প্রধান রক্ষণীয় যন্ত্র হওয়াতে যাহারা বাম হাত রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত রাখিত তাহারাই অধিকাংশ সময়ে সফল হইত এবং টিঁকিয়া গিয়া তাহারাই বংশবৃদ্ধির কার্য্য করিত। এইরূপে ক্রমে বাম হাতই বিশেষরূপে আত্মরক্ষার কার্য্যে এবং দক্ষিণ হাত বিশেষ করিয়া আক্রমণ-কার্য্যে ব্যবহার হইতে লাগিল। কিন্তু শরীরের একটি নিয়ম আছে যে, কোন অঙ্গকে নিয়মিতরূপে বেশী করিয়া খাটাইলে তাহার বৃদ্ধি ও উন্নতি হয়। এই নিয়মানুসারে দক্ষিণ হস্ত ক্রমে বাম অপেক্ষা সবল ও কার্য্যনিপুণ হইয়া উঠিল।

এই পার্থক্য একবার অল্প পরিমাণে দাঁড়াইয়া যাইতেই সকলে স্বভাবতই অধিকাংশ কার্য্য সুদক্ষ এবং নিপুণতর হস্ত দ্বারাই সম্পন্ন করিত; সুতরাং এই পার্থক্য ক্রমে দৃঢ় ও স্থায়ী হইল।

এই সামান্য আরম্ভ হইতে এখন দক্ষিণ বাম হস্তের পৃথক কর্ত্তব্য নানাদেশে নানা জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, এইরূপ না হইয়া দুই হাতের দ্বারা সমান ভাবে কার্য্য পাইলেই বুঝি সুবিধা হইত; কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে ইহাতে ভালই হইয়াছে। প্রত্যেক লোকে যদি নিজ নিজ সূতারের কার্য্য করিত তাহা হইলে না তাহার অন্য কার্য্য করিবার ভালরূপ অবসর থাকিত, না সূতারের কার্য্যের কোন উন্নতি হইত—ভিন্ন লোকের দ্বারা ভিন্ন কার্য্য হইলে কারিগরির খুব উন্নতি হয়। দুই হাত সমানভাবে কার্য্য করিলে সকল কার্য্যই মাঝারি রকম করিতে পারিত, এখন পৃথক কার্য্য করে বলিয়াই এত উত্তম রকমে করিতে পারে।

রসবোধ। আমরা কথায় বলি "ছয় রস" এবং তাহাতে এই বিশ্বাস প্রকাশ পায় যে, অম্ল, মধুর, লবণ, তিক্ত, কটু, কষায়—

এই কয়টি অনুভূতি একই জাতীয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবে দেখিতে গেলে এ কথাটি ঠিক নহে। সব কয়টির জিহ্বার সহিত কতকটা সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু বেশী গরম জিনিষ খাইলে জিহ্বায় বেদনা উপস্থিত হয় বলিয়া আমরা উত্তাপকে রসের মধ্যে গণ্য করি না। তাহার কারণ কি? সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাহা এই যে, শরীরের সমস্ত ত্বকেই উত্তাপ অনুভূত হইতে পারে, জিহ্বার উপর উহার বিশেষ কোন প্রভাব নাই।

এই যুক্তি অনুসারে যদি বিচার করিতে হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, কেবল মধু ও তিক্ত এই দুইটি রস প্রকৃতপক্ষে রস নামের অধিকারী। বাকী রসগুলি ক্ষার উত্তাপ প্রভৃতির দলে যাইতে পারে; কারণ, সমস্ত ত্বকেই তাহারা কার্য্য করিতে পারে।

জিহ্বাতে তিন জাতীয় স্নায়ুর সমাবেশ দেখা যায়। ত্বকের সর্ব্বত্র যেরূপ স্নায়ু, জিহ্বার ডগায়ও সেইরূপ। জিহ্বার মধ্যবর্ত্তী স্নায়ুগুলিতে বিশেষরূপে রসাস্বাদনের ক্ষমতা আছে। জিহ্বার গোড়ায় গলার নিকটে যে স্নায়ুগুলি আছে তাহারা পরিপাকোপযোগী পদার্থসকল বাছিয়া লইবার কার্য্যে নিযুক্ত।

টক্ ঝাল লোণতা প্রভৃতি জিহ্বার ডগার দ্বারা অনুভূত হয়। জিহ্বার মধ্যস্থানে একটী লঙ্কা রাখিলে তাহার কটুত্ব বোধ হইবে না। টক্ লোণতা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।* এখানে কথা উঠিতে পারে যে, তাহা হইলে যে লেবু টক্ লাগিতেছে বা যে

---

* এবিষয়ে পরীক্ষাকালে জিহ্বা আর্দ্র থাকিলে চলিবে না; তাহা হইলে যে পদার্থ পরীক্ষার্থে জিহ্বার মধ্যস্থানে রাখা যাইবে তাহার রস লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া সমস্ত জিহ্বাময় ছড়াইয়া পড়িবে। যিনি এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়াছিলেন তিনি বাতাস দিয়া জিহ্বা একেবারে শুকাইয়া ফেলিয়া তবে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

লঙ্কা ঝাল লাগিতেছে তাহা হাতে লাগিলে কিছু টের পাওয়া যায় না কেন? ইহার কারণ এই যে, হাতের তেলোর চর্ম্ম বিশেষরূপে শক্ত ও অপেক্ষাকৃত অসাড়। শুধু হাতের নহে চোখের ভিতরকার ত্বক ছাড়া শরীরের আর সকল স্থানের ত্বক জিহ্বার ডগার ত্বক অপেক্ষা কঠিন ও অসাড়—সেইজন্য টক্ ঝাল প্রভৃতি পদার্থ যে পরিমাণে জিহ্বা স্পর্শ করিলে অথবা চোখের মধ্যে প্রবেশ করিলে অনুভূত হয় তাহা অপেক্ষা অনেকটা তীব্র না হইলে, শরীরের অন্য স্থানে বড় বোধগম্য হয় না। লেবু লঙ্কায় হাতে কিছু করিতে পারে না বটে, কিন্তু কড়া এসিড্ বা ঝাই হাতে লাগিলে বিলক্ষণ টের পাওয়া যায়।

যে পদার্থসকলের মাংসপেশী টানিয়া ধরিবার ক্ষমতা আছে সেইগুলিকে আমরা কষা বলি। কষা জিনিষও শরীরের সকল স্থানের মাংসপেশী টানিয়া ধরিতে পারে।

মধু এবং তিক্তরসের কথা স্বতন্ত্র। ইহারা বাস্তবিকই রস; কেবলমাত্র জিহ্বার বিশেষ স্নায়ুর দ্বারা অনুভূত হয় এবং শরীরের অন্য কোন স্থানে কোনরূপ বিশেষ বোধ উৎপন্ন করে না।

জিহ্বার ডগার স্নায়ুগুলি রুচি বা অরুচি বোধ জন্মাইয়া দেয়। এই স্থানে দুধ ঘি ভাল কি মন্দ, মাছ মাংস টাট্‌কা কি পচা তাহা ধরা পড়ে এবং সেই অনুসারে গিলিয়া কিম্বা তুলিয়া ফেলিবার প্রবৃত্তি জন্মায়।

আদিম মানুষের অবস্থা স্মরণ করিলে জিহ্বার এইরূপ বিভাগের সার্থকতা বুঝা যায়। সেকালে এত ভিন্নরকম উদ্ভিদের মধ্যে কোন্‌টি সুখাদ্য কোন্‌টি অখাদ্য, কোন্‌টি পুষ্টিকর কোন্‌টি বা বিষাক্ত তাহা পূর্ব্ব হইতে আদিম মানবের নির্ণয় করিবার কোন উপায় ছিল না। সেই নিমিত্ত ক্ষুধাবোধ হইলে আন্দা-

খাদ্য উপস্থিত না থাকিলে বেচারার অগত্যা অজানা খাদ্য মুখে দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইত। এখন, ইহা কেহই অস্বীকার করিবে না যে, চিড়বিড় করিয়া জলিয়া পুড়িয়া মরা সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক মৃত্যু; সেইজন্য টক্ ঝাল প্রভৃতি পদার্থসকল জিহ্বার ডগায় ঠেকিতে না ঠেকিতেই ত্যক্ত হইত।

এই প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে খাদ্যগুলি জিহ্বার মধ্যস্থান পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিত সেগুলি মিষ্ট কি তিক্ত ইহা দেখা হইত। ইহা একটি সাধারণ নিয়ম বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, যে উদ্ভিজ্জপদার্থসকল স্বাভাবিক অবস্থায় তিক্ত সেগুলি বিষাক্ত বা অপকারী এবং যেগুলি মিষ্ট সেগুলি সারবিশিষ্ট ও উপকারী। সুতরাং তিক্ত স্বাভাবিক অবস্থায় মনুষ্যের বরই অপ্রিয় এবং মিষ্ট উপাদেয়।

তবে টক্ ঝাল তিক্ত এখন পরম তৃপ্তির সহিত খাওয়া হয় কেন? প্রথমাবস্থায় মনুষ্য অন্যান্য জীবের ন্যায় কিছু বেশী রকম প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে ছিল। ক্রমে নিজ বুদ্ধিবলে উহারা এমন অনেক জিনিষ আবিষ্কার করিল যাহা তিক্ত অথচ উপকারী, যাহা মিষ্ট অথচ অপকারী, এবং সেই সঙ্গে বুঝিয়া লইল যে, টক্ ঝাল লোণতা প্রভৃতি কি পরিমাণে আহার্য্যের সহিত মিশাইলে পরিপাকের সাহায্য এবং জলবায়ুর দোষ খণ্ডন করে। তবে অবশ্য প্রকৃতির শাসন এখন পর্য্যন্ত আমরা সম্পূর্ণরূপ উপেক্ষা করিতে পারি নাই। এখনো অধিক পরিমাণে তিক্ত কাহারো ভাল লাগে না এবং মিষ্টই এখনো সর্ব্বলোকপ্রিয়। আজও প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে ঝাল টক্ খাইলে অম্বল প্রভৃতি রোগের দ্বারা তাহার শাস্তি পাওয়া যায়। এখন সভ্য মনুষ্যের এত জটিল জীবন হইয়া পড়িয়াছে যে,

স্বাভাবিক নিয়মে থাকিলেও ঠিক হয় না, অথচ প্রকৃতিকে একেবারে বাদ দিলেও কাজ চলে না।

অনাবশ্যক রক্তশোষণ। মশা রক্ত খায় কি না এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিলে যাঁহার মশারিতে গর্ত্ত আছে তিনি কিছু বিস্মিত হইতে পারেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কতকগুলি গুরুতর কারণ আছে।

মশা যে রক্তশোষণ করিয়া তাহার দ্বারা নিজ উদর পরিপূর্ণ করে ইহা অবশ্য নিতান্ত গোঁড়া বৈজ্ঞানিকেরও স্বীকার করিতে হয়—কিন্তু গোল এই যে, অনুসন্ধানের দ্বারা জানা গিয়াছে যে, মশার পেটটি একটি খোলমাত্র—উহার মধ্যে পরিপাকের কোনপ্রকার যন্ত্র বা উপায় নাই।

কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, পরিপাকযন্ত্রের অভাবে রক্ত কেন, কোন জিনিষই খাইবার চেষ্টা করা মশার পক্ষে বিড়ম্বনা; তাহা হইলে মশা কি অন্যান্য জীব অপেক্ষা এই স্বতন্ত্র প্রণালীতে গঠিত যে, উহারা না খাইয়াও জীবনধারণ করিতে সক্ষম?

যাঁহারা এপ্রকার আপত্তি করেন তাঁহারা নিশ্চয়ই মশার জীবনের ইতিহাস অবগত নহেন। তাঁহাদের বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, মশা সমস্ত জীবন এইরূপ পক্ষবিশিষ্ট, উদরবিহীন রক্তশোষক জীব নহে।

মশা জলের ভিতর ডিম পাড়িয়া থাকে। এবং জলেরই ভিতর তাহার সন্তানবর্গ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এই জল যদি বদ্ধ ও আবর্জ্জনাপূর্ণ থাকে তাহা হইলে মশাশাবকগুলি প্রচুর পরিমাণে আহার করিয়া উত্তমরূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

ইহাদের মাথার দিকটা অপেক্ষাকৃত বড় ও গোলাকার এবং ল্যাজের দিকটা সরু। ইহারা ল্যাজে মাথায় স্পর্শ করিতে

করিতে কিলবিল করিয়া জলের মধ্যে খাদ্য অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় এবং নিশ্বাস ফেলিবার আবশ্যক হইলে জলের উপরিভাগে আসিয়া মাথা নীচে এবং ল্যাজের দিকটা উপর (কারণ পশ্চাৎদিকেই উহাদের নিশ্বাস ফেলিবার গর্ত্ত থাকে) করিয়া ভাসিয়া থাকে। এই পোকাগুলি সকলেই বোধ করি কিছুদিনের রাখা জলে দেখিয়া থাকিবেন কিন্তু খুব সম্ভব অনেকেই এগুলিকে ভাবী মশা বলিয়া চিনিতে পারেন না, তা' না হইলে পক্ষপ্রাপ্ত অবস্থায় অনেক কষ্টে এক একটি চপেটাঘাতে এক একটি মশা মারিবার চেষ্টা না করিয়া তাঁহারা একেবারে জালা জালা মশা বিনষ্ট করিতে পারিতেন।

মশাগুলি যখন এইরূপ বাল্যাবস্থার শেষ সীমায় উপস্থিত হয় তখন কিছুক্ষণ স্থিরভাবে জলের উপর ভাসিয়া থাকে। ক্রমে উহাদের খোলস্ ফাটিয়া যায় এবং তাহার মধ্য হইতে পূর্ণ-অবয়ব পক্ষবিশিষ্ট মশা ধীরে ধীরে বাহির হয়। এই সময়ে জলে ঢেউ থাকিলে এই মশা জলমগ্ন হইয়া মরিয়া যায়; কারণ, এ অবস্থায় উহার আর জলে বাঁচিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু অবস্থা যদি অনুকূল থাকে তাহা হইলে এই নবজাত মশাটি কিছুক্ষণ উহার পূর্ব্ব আবরণকে তরী করিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়। তাহার পর নূতন পৃথিবীটা কিয়ৎপরিমাণে অভ্যস্ত হইয়া আসিলে নূতনলব্ধ পক্ষ বিস্তার করিয়া প্রথমে কিছুক্ষণ বিক্ষিপ্ত-ভাবে এদিক-ওদিক করিয়া ক্রমে সজোরে উড়িয়া চলিয়া যায়।

এই সুখের অবস্থায় উহারা পৃথিবীতে দুই তিন দিন, বড় জোর এক সপ্তাহের অধিক জীবনধারণ করিতে পারে না। খাওয়া-দাওয়ার কোনপ্রকার উৎপাত থাকে না। কাজের মধ্যে কেবল ডিম পাড়া আর মানুষের নিদ্রার ব্যাঘাত করা।

এখন কথা এই যে, মশা যদি রক্ত নাই হজম করিতে পারে তাহা হইলে এত হাঙ্গাম করিয়া মৃত্যুর সম্ভাবনা অবহেলা করিয়া উহার এ কার্য্য করিবার আবশ্যক কি?

দুঃখের মধ্যে এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের নিকট কোন পাকা-রকম সন্তোষজনক উত্তর পাবার যো নাই।

নানাপ্রকার অনুমান করা যাইতে পারে। হয় ত গরম গরম রক্ত উহাদের ডিমে তা দিবার সাহায্য করে; কিন্তু তাহা হইলে যে হতভাগ্য মশারা রক্তের আস্বাদবিবর্জ্জিত হইয়া জঙ্গলেই সমস্ত জীবন কাটাইতে বাধ্য হয় তাহাদের ডিমে তা দিবার কি ব্যবস্থা হয়? এমনও হইতে পারে যে, রক্ত মশার একটি সখের সামগ্রী। মদ্য যে মনুষ্যের বিশেষ উপকার করে তাহা নহে কিন্তু মনুষ্য ত অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াও উহা খাইতে ছাড়ে না। হয় ত মনুষ্যের রক্তপানে মশার সেইরূপ কোন নেশা হয়।

যাহাই হোক্ কালক্রমে এই অনাবশ্যকীয় অথচ সম্পূর্ণ বিপদ্-জনক অভ্যাস যে কেন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে লোপ পাইল না, তাহা একটু আশ্চর্য্যের বিষয়।

সমস্যা-পূরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঝিঁক্‌ড়াকোটার কৃষ্ণগোপাল সরকার জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি জমিদারী এবং সংসারের ভার দিয়া কাশী চলিয়া গেলেন। দেশের যত অনাথ দরিদ্র লোক তাঁহার জন্য হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল—এমন বদান্যতা এমন ধর্ম্মনিষ্ঠতা কলিযুগে দেখা যায় না, এই কথা সকলেই বলিতে লাগিল।

তাঁহার পুত্র বিপিনবিহারী আজকালকার একজন সুশিক্ষিত বি এ। দাড়ি রাখেন, চষমা পরেন, কাহারো সহিত বড় একটা মিশেন না। অতিশয় সচ্চরিত্র—এমন কি, তামাকটি পর্য্যন্ত খান না, তাস পর্য্যন্ত খেলেন না। অত্যন্ত ভালমানুষের মত চেহারা, কিন্তু লোকটা ভারি কড়াকড়।

তাঁহার প্রজারা শীঘ্রই তাহা অনুভব করিতে পারিল। বুড়া কর্ত্তার কাছে রক্ষা ছিল কিন্তু ইঁহার কাছে কোন ছুতায় দেনা খাজনার এক পয়সা রেয়াৎ পাইবার প্রত্যাশা নাই। নির্দ্দিষ্ট সময়েরও একদিন এদিক-ওদিক হইতে পায় না।

বিপিনবিহারী হাতে কাজ লইয়াই দেখিলেন তাঁহার বাপ বিস্তর ব্রাহ্মণকে জমি বিনা খাজনায় ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং খাজনা যে কত লোককে কমি দিয়াছেন তাহার আর সংখ্যা নাই। তাঁহার কাছে কেহ একটা কিছু প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না—সেটা তাঁহার একটা দুর্ব্বলতা ছিল।

বিপিনবিহারী কহিলেন, এ কখনই হইতে পারে না। অর্দ্ধেক জমিদারী আমি লাখেরাজ ছাড়িয়া দিতে পারি না। তাঁহার মনে নিম্নলিখিত দুই যুক্তির উদয় হইল।

প্রথমতঃ, যে সকল অকর্ম্মণ্য লোক ঘরে বসিয়া এই সকল জমির উপস্বত্ব ভোগ করিয়া স্ফীত হইতেছে তাহারা অধিকাংশই অপদার্থ এবং দয়ার অযোগ্য। এরূপ দানে দেশে কেবল আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়তঃ—তাঁহার পিতৃপিতামহের সময়ের অপেক্ষা এখন জীবিকা অত্যন্ত দুর্লভ এবং দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। অভাব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এখন একজন ভদ্রলোকের আত্মসম্ভ্রম

রক্ষা করিয়া চলিতে পূর্ব্বাপেক্ষা চারগুণ খরচ পড়ে। অতএব তাঁহার পিতা যেরূপ নিশ্চিন্ত মনে দুই হস্তে সমস্ত বিলাইয়া ছড়াইয়া গিয়াছেন এখন আর তাহা করিলে চলিবে না, বরঞ্চ সেগুলি কুড়াইয়া বাড়াইয়া আবার ঘরে আনিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

কর্ত্তব্যবুদ্ধি তাঁহাকে যাহা বলিল তিনি তাহাই করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি একটা প্রিন্সিপ্‌ল্‌ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন।

ঘর হইতে যাহা বাহির হইয়াছিল আবার তাহা অল্পে অল্পে ঘরে ফিরিতে লাগিল। পিতার অতি অল্প দানই তিনি বাহাল রাখিলেন, এবং যাহা রাখিলেন তাহাও যাহাতে চিরস্থায়ী দানের স্বরূপে গণ্য না হয় এমন উপায় করিলেন।

কৃষ্ণগোপাল কাশীতে থাকিয়া পত্রযোগে প্রজাদিগের ক্রন্দন শুনিতে পাইলেন—এমন কি, কেহ কেহ তাঁহার নিকটে গিয়াও কাঁদিয়া পড়িল। কৃষ্ণগোপাল বিপিনবিহারীকে পত্র লিখিলেন যে, কাজটা গর্হিত হইতেছে।

বিপিনবিহারী উত্তরে লিখিলেন, পূর্ব্বে যেমন দান করা যাইত তেমনি পাওনা নানাপ্রকারের ছিল। তখন জমিদার এবং প্রজা উভয়পক্ষের মধ্যেই দানপ্রতিদান ছিল। সম্প্রতি নূতন নূতন আইন হইয়া কেবলমাত্র ন্যায্য খাজনা ছাড়া অন্য পাঁচ রকম পাওনা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে, এবং কেবলমাত্র খাজনা আদায় করা ছাড়া জমিদারের অন্যান্য গৌরবজনক অধিকারও উঠিয়া গিয়াছে—অতএব এখনকার দিনে যদি আমি আমার ন্যায্য পাওনার দিকে কঠিন দৃষ্টি না রাখি তবে আর আমার থাকে কি! এখন প্রজাও আমাকে অতিরিক্ত কিছু দিবে না আমিও তাহাকে অতিরিক্ত কিছু দিব না—এখন আমাদের মধ্যে কেবলমাত্র দেনাপাওনার সম্পর্ক। দান খয়রাৎ করিতে গেলে

ফতুর হইতে হইবে; বিষয় রক্ষা এবং কুলসম্ভ্রম রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পড়িবে।

কৃষ্ণগোপাল সময়ের এতাধিক পরিবর্ত্তনে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিতেন এবং ভাবিতেন এখনকার ছেলেরা এখনকার কালের উপযোগী কাজ করিতেছে—আমার সেকালের নিয়ম এখন খাটিবে না। আমি দূরে বসিয়া ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে তাহারা বলিবে, তবে তোমার বিষয় তুমি ফিরিয়া লও, আমরা ইহা রাখিতে পারিব না। কাজ কি বাপু, এ কয়টা দিন কোনমতে হরিনাম করিয়া কাটাইয়া দিতে পারিলে বাঁচি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এই ভাবে কাজ চলিতে লাগিল। অনেক মকদ্দমা-মামলা হাঙ্গাম ফেসাদ্ করিয়া বিপিনবিহারী সমস্তই প্রায় একপ্রকার মনের মত গুছাইয়া লইলেন।

অনেক প্রজাই ভয়ক্রমে বশ্যতা স্বীকার করিল, কেবল মির্জ্জা বিবির পুত্র অছিমদ্দি বিশ্বাস কিছুতেই বাগ মানিল না।

বিপিনবিহারীর আক্রোশও তাহার উপরে সব চেয়ে বেশি। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্রর একটা অর্থ বোঝা যায় কিন্তু এই মুসলমান সন্তান যে কি হিসাবে এতটা জমি নিষ্কর ও স্বল্প করে উপভোগ করে বুঝা যায় না। একটা সামান্য যবন বিধবার ছেলে, গ্রামের ছাত্রবৃত্তি-স্কুলে দুই ছত্র লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে কিন্তু আপনার সৌভাগ্যগর্ব্বে সে যেন কাহাকেও গ্রাহ্যই করে না।

বিপিন পুরাতন কর্ম্মচারীদের কাছে জানিতে পারিলেন কর্ত্তার আমল হইতে বাস্তবিক ইহারা বহুকাল অনুগ্রহ পাইয়া আসিতেছে। কিন্তু এ অনুগ্রহের কোন বিশেষ কারণ তাহারা নির্ণয়

করিতে পারে না। বোধ করি, অনাথা বিধবা নিজ দুঃখ জানাইয়া কর্ত্তার দয়া উদ্রেক করিয়াছিল।

কিন্তু বিপিনের নিকট এই অনুগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা অযোগ্য বলিয়া প্রতিভাত হইল। বিশেষতঃ ইহাদের পূর্ব্বেকার দরিদ্র অবস্থা বিপিন দেখেন নাই, এখন ইহাদের স্বচ্ছলতার বাড়াবাড়ি এবং অপর্য্যাপ্ত দম্ভ দেখিয়া বিপিনের মনে হইত ইহারা যেন তাঁহার দয়া-দুর্ব্বল সরল পিতাকে ঠকাইয়া তাঁহাদের বিষয়ের এক অংশ চুরি করিয়া লইয়াছে।

অছিমদ্দিও উদ্ধতপ্রকৃতির যুবক। সে বলিল, প্রাণ যাইবে তবু আমার অধিকারের এক তিল ছাড়িয়া দিব না। উভয়-পক্ষে ভারি যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল।

অছিমদ্দির বিধবা মাতা ছেলেকে বারবার করিয়া বুঝাইল, জমিদারের সহিত কাজিয়া করিয়া কাজ নাই, এতদিন যাঁহার অনুগ্রহে জীবন কাটিল তাঁহার অনুগ্রহের পরে নির্ভর করাই কর্ত্তব্য, জমিদারের প্রার্থনামত কিছু ছাড়িয়া দেওয়া যাক্।

অছিমদ্দি কহিল, মা, তুমি এ সকল বিষয় কিছুই বোঝ না।

মকদ্দমায় অছিমদ্দি একে একে হারিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যতই হার হইতে লাগিল ততই তাহার জিদ্ বাড়িয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বস্বের জন্য সে সর্ব্বস্বই পণ করিয়া বসিল।

মির্জ্জা বিবি একদিন বৈকালে বাগানের তরিতরকারী কিঞ্চিৎ উপহার লইয়া ছেলেকে লুকাইয়া গোপনে বিপিন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। বৃদ্ধা যেন তাহার মাতৃদৃষ্টির দ্বারা সস্নেহে বিপি-নের সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া কহিল, "তুমি আমার বাপ, আল্লা তোমার ভাল করুন। বাবা, অছিমকে তুমি নষ্ট করিয়ো না, ইহাতে তোমার ধর্ম্ম হইবে না। তাহাকে আমি তোমার হস্তেই

সমর্পণ করিলাম—তাহাকে নিতান্তই অবশ্য-প্রতিপাল্য একটি অকর্ম্মণ্য ছোট ভাইয়ের মত গ্রহণ কর—সে তোমার অসীম ঐশ্বর্য্যের একটি ক্ষুদ্র এককণা পাইয়াছে বলিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়ো না বাপ্!”

অধিক বয়সের স্বাভাবিক প্রগল্‌ভতাবশতঃ বুড়ি তাঁহার সহিত ঘরকন্না পাতাইতে আসিয়াছে দেখিয়া বিপিন ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল—“তুমি মেয়ে মানুষ, এ সমস্ত কথা কিছুই বোঝ না। যদি কিছু জানাইবার থাকে তোমার ছেলেকে পাঠাইয়া দিয়ো।”

মির্জ্জা বিবি নিজের ছেলে এবং পরের ছেলে উভয়ের কাছেই শুনিল, সে এ বিষয়ের কিছুই বোঝে না। আল্লার নাম স্মরণ করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বিধবা ঘরে ফিরিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মকদ্দমা ফৌজদারী হইতে দেওয়ানী—দেওয়ানী হইতে জেলা-আদালত, জেলা-আদালত হইতে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত চলিল। বৎসর দেড়েক এম্‌নি করিয়া কাটিয়া গেল। অছিমদ্দি যখন দেনার মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়াছে তখন আপিল-আদালতে তাহার আংশিক জয় সাব্যস্ত হইল।

কিন্তু ডাঙ্গার বাঘের মুখ হইতে যেটুকু বাঁচিল জলের কুমীর তাহার প্রতি আক্রমণ করে। মহাজন সময় বুঝিয়া ডিক্রিজারী করিল। অছিমদ্দির যথাসর্ব্বস্ব নিলাম হইবার দিন স্থির হইল।

সে দিন সোমবার, হাটের দিন। ছোট একটি নদীর ধারে হাট। বর্ষাকালে নদী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কতক নৌকায় এবং কতক ডাঙ্গায় কেনাবেচা চলিতেছে, কলরবের অন্ত নাই। পণ্যদ্রব্যের মধ্যে এই আষাঢ় মাসে কাঁঠালের আমদানীই সব

চেয়ে বেশি, ইলিশ মাছও যথেষ্ট। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; অনেক বিক্রেতা বৃষ্টির আশঙ্কায় বাঁশ পুঁতিয়া তাহার উপর একটা কাপড় খাটাইয়া দিয়াছে।

অছিমদ্দিও হাট করিতে আসিয়াছে—কিন্তু তাহার হাতে একটি পয়সাও নাই, এবং তাহাকে আজকাল কেহ ধারেও বিক্রয় করে না। সে একটি কাটারি এবং একটি পিতলের থালা হাতে করিয়া আসিয়াছে, বন্ধক রাখিয়া ধার করিবে।

বিপিন বাবু বিকালের দিকে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গে দুই তিন জন লাঠিহস্তে পাইক চলিয়াছে। কলরবে আকৃষ্ট হইয়া তিনি একবার হাট দেখিতে ইচ্ছুক হইলেন।

হাটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারী কলুকে কৌতূহলবশতঃ তাহার আয়ব্যয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন এমন সময় অছিমদ্দি কাটারি তুলিয়া বাঘের মত গর্জ্জন করিয়া বিপিন বাবুর প্রতি ছুটিয়া আসিল। হাটের লোক তাহাকে অর্দ্ধপথে ধরিয়া তৎক্ষণাৎ নিরস্ত্র করিয়া ফেলিল—অবিলম্বে তাহাকে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করা হইল এবং আবার হাটে যেমন কেনাবেচা চলিতেছিল চলিতে লাগিল।

বিপিন বাবু এই ঘটনায় মনে মনে যে খুসি হন নাই তাহা বলা যায় না। আমরা যাহাকে শিকার করিতে চাহি সে যে আমাদিগকে থাবা মারিতে আসিবে এরূপ বজ্জাতী এবং বেআদবী অসহ্য। যাহা হৌক্, বেটা যেরূপ বদ্‌মায়েস্ সেইরূপ তাহার উচিত শাস্তি হইবে। বিপিনের অন্তঃপুরে মেয়েরা আজিকার ঘটনা শুনিয়া কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন—সকলেই বলিলেন, মাগো, কোথাকার বজ্জাত হারামজাদা বেটা! তাহার উচিত শাস্তির সম্ভাবনায় তাঁহারা অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করি-

গেল। এদিকে সেই সন্ধ্যাবেলায় বিধবার অন্নহীন পুত্রহীন গৃহ মৃত্যুর অপেক্ষাও অন্ধকার হইয়া গেল। এই ব্যাপারটা সকলেই ভুলিয়া গেল, আহারাদি করিল, শয়ন করিল, নিদ্রা দিল—কেবল একটি বৃদ্ধার কাছে পৃথিবীর সমস্ত ঘটনার মধ্যে এইটেই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়া উঠিল, অথচ ইহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত সমস্ত পৃথিবীতে আর কেহই নাই, কেবল দীপহীন কুটীরপ্রান্তে কয়েকখানি জীর্ণ অস্থি এবং একটি হতাশাস ভীত হৃদয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ইতিমধ্যে দিন তিনেক অতিবাহিত হইয়া গেছে। কাল ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারের দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিপিনকেও সাক্ষ্য দিতে যাইতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে জমিদারকে কখনো সাক্ষ্যমঞ্চে দাঁড়াইতে হয় নাই—কিন্তু বিপিনের ইহাতে কোন আপত্তি নাই।

পরদিন যথাসময়ে পাগড়ি পরিয়া ঘড়ির চেন ঝুলাইয়া পাল্কী চড়িয়া মহা সমারোহে বিপিন বাবু কাছারিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাঁহাকে সসম্ভ্রমে আপন পার্শ্ববর্ত্তী আসনে স্থান দিলেন। এজ্‌লাসে আজ আর লোক ধরে না। এতবড় হুজুক্ আদালতে অনেক দিন ঘটে নাই।

যখন মকদ্দমা উঠিতে আর বড় বিলম্ব নাই, এমন সময় একজন বরকন্দাজ আসিয়া বিপিন বাবুর কাণে কাণে কি একটা কথা বলিয়া দিল—তিনি শশব্যস্ত হইয়া আবশ্যক আছে বলিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কিছু দূরে এক বটতলায় তাঁহার বৃদ্ধ পিতা দাঁড়াইয়া আছেন। খালি পা, গায়ে একখানি নামা-

বলী, হাতে হরিনামের মালা, কৃশ শরীরটি যেন স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময়। ললাট হইতে একটি শান্ত করুণা বিশ্বে বিকীর্ণ হইতেছে।

বিপিন চাপকান জোব্বা এবং অাঁট প্যাণ্ট্‌লুন্‌ লইয়া কষ্টে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মাথার পাগড়িটি নাসাপ্রান্তে নামিয়া আসিল, ঘড়িটি জেব হইতে বাহির হইয়া পড়িল; সেগুলি শশব্যস্তে সারিয়া লইয়া পিতাকে নিকটবর্ত্তী উকীলের বাসায় প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন। কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, না, আমার যাহা বক্তব্য আমি এইখানেই বলিয়া লই। বিপিনের অনুচরগণ কৌতূহলী লোকদিগকে দূরে ঠেলিয়া রাখিল।

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন—অছিম যাহাতে খালাস পায় সেই চেষ্টা করিতে হইবে এবং উহার যে সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছ তাহা ফিরাইয়া দিবে।

বিপিন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এইজনাই আপনি কাশী হইতে এত দূরে আসিয়াছেন? উহাদের পরে আপনার এত অধিক অনুগ্রহ কেন?

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন—সে কথা শুনিয়া তোমার লাভ কি হইবে বাপু?

বিপিন ছাড়িলেন না—কহিলেন,"অযোগ্যতা বিচার করিয়া কত লোকের কত দান ফিরাইয়া লইয়াছি, তাহার মধ্যে কত ব্রাহ্মণও ছিল, আপনি তাহার কিছুতে হস্তক্ষেপ করেন নাই, আর এই মুসলমান সন্তানের জন্য আপনার এতদূর পর্য্যন্ত অধ্যবসায়! আজ এত কাণ্ড করিয়া অবশেষে যদি অছিমকে খালাস দিতে এবং সমস্ত ফিরাইয়া দিতে হয় ত লোকের কাছে কি বলিব!"

কৃষ্ণগোপাল কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে দ্রুত-

কম্পিত অঙ্গুলিতে মালা ফিরাইতে ফিরাইতে কিঞ্চিৎ কম্পিত-স্বরে কহিলেন, "লোকের কাছে যদি সমস্ত খুলিয়া বলা আবশ্যক কর ত বলিয়ো, অছিমদ্দিন তোমার ভাই হয়, আমার পুত্র।"

বিপিন চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন—যবনীর গর্ভে?

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন—হাঁ বাপু!

বিপিন অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিলেন, সে সব কথা পরে হইবে এখন আপনি ঘরে চলুন।

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন—না, আমি ত আর গৃহে প্রবেশ করিব না। আমি এখনি এখান হইতে ফিরিয়া চলিলাম। এখন তোমার ধর্ম্মে যাহা উচিত বোধ হয় করিয়ো। বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া অশ্রুনিরোধপূর্ব্বক কম্পিতকলেবরে ফিরিয়া চলিলেন।

বিপিন কি বলিবে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু এটুকু তাহার মনে উদয় হইল, সেকালের ধর্ম্মনিষ্ঠতা এইরূপই বটে! শিক্ষা এবং চরিত্রে আপনাকে আপনার পিতার চেয়ে ঢের শ্রেষ্ঠ বোধ হইল। স্থির করিলেন, একটা প্রিন্সিপ্‌ল্ না থাকার এই ফল!

আদালতে যখন ফিরিলেন, দেখিলেন শীর্ণ ক্লিষ্ট শুষ্ক শ্বেত-ওষ্ঠাধর দীপ্তনেত্র অছিম দুই পাহারাওয়ালার হস্তে বন্দী হইয়া একখানি মলিন চীর পরিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে বিপিনের ভ্রাতা!

ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত বিপিনের বন্ধুত্ব ছিল। মকদ্দমা একপ্রকার গোলমাল করিয়া ফাঁসিয়া গেল। এবং অছিমও অল্প-দিনের মধ্যে পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাইল। কিন্তু তাহার কারণ সেও বুঝিতে পারিল না, অন্য লোকেও আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

মকদ্দমায় সময় যে, কৃষ্ণগোপাল আসিয়াছিলেন সে কথা রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। সকলেই নানা কথা কাণাকাণী করিতে লাগিল।

সূক্ষ্মবুদ্ধি উকীলেরা ব্যাপারটা সমস্তই অনুমান করিয়া লইল। রামতারণ উকীলকে কৃষ্ণগোপাল নিজের খরচে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছিলেন—সে বরাবরই সন্দেহ করিত কিন্তু এতদিনে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল যে, ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে সকল সাধুই ধরা পড়ে। যিনি যত মালা জপুন পৃথিবীতে আমার মতই সব বেটা! সংসারে সাধু অসাধুর মধ্যে প্রভেদ এই যে, সাধুরা কপট এবং অসাধুরা অকপট! যাহা হউক্, কৃষ্ণগোপালের জগদ্বিখ্যাত দয়াধর্ম্মমহত্ত্ব সমস্তই যে কাপট্য ইহাই স্থির করিয়া রামতারণের যেন এতদিনকার একটা দুর্ব্বোধ সমস্যার পূরণ হইল এবং কি যুক্তি অনুসারে জানি না, তাহাতে কৃতজ্ঞতার বোঝাও যেন স্কন্ধ হইতে লঘু হইয়া গেল। ভারি আরাম পাইল।

সৃষ্টি।

সম্প্রতি মাসিকপত্রে আফ্রিকানিবাসী জাতিবিশেষের মধ্যে প্রচলিত সৃষ্টিপ্রসঙ্গ লইয়া অনেক তামাসা চলিয়াছিল। চাঁদ ও ব্যাঙের মধ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়া সৃষ্টিক্রিয়াটা নির্ব্বিঘ্নে সমাহিত হইয়া যায়; তবে উভয়ের বিরোধের ফলে সৃষ্ট জগৎটা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। বিবাদ হইল চাঁদে ও ব্যাঙে; তাহার ফলভোগী হইল মানুষে; আধিব্যাধি জরা মরণ আসিয়া জগৎ অধিকার করিল।

চাঁদ ও ব্যাঙের স্থলে আর দুইটা প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিলে এই সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত বিজ্ঞজনানুমোদিত আর একটি সৃষ্টিতত্ত্বের বড় বৈষম্য দেখা যায় না। বিবাদ ঘটিয়াছিল ঈশ্বরে আর শয়তানে; ফলভাগী হইয়াছে দুর্ভাগা মানুষ। কবে ও কোথায় এই বিবাদ সংঘটিত হইয়াছিল, বিস্তর গবেষণা দ্বারা তাহা স্থির হইতে পারে। এবং মনুষ্য-গর্দ্দভের উপর দুর্ভাগ্য-বোঝা আরোপণের নৈতিকতা সম্বন্ধেও বহুল সারগর্ভ যুক্তি প্রচলিত আছে।

শয়তানের আকারপ্রকার সম্বন্ধে কোনরূপ মতভেদ আছে কি না বিশেষ জানি না। শুনা যায় বিখ্যাত ফরাসীস্ প্রাণিতত্ত্ববিৎ কুবীয়ের সম্মুখে শয়তান উপস্থিত হইয়া ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কুবীয় সহজে ভয় পাইবার ব্যক্তি ছিলেন না। দার্শনিকোচিত গাম্ভীর্য্যসহকারে তিনি শয়তানকে বলিলেন, বাপুহে, শিং ও খুরেই ধরা পড়িয়াছ; মাংস হজমের শক্তি রাখ না, আমাকে খাইবে কিরূপে? কিঞ্চিৎ ঘাস দিতেছি, রোমন্থন কর।

সৃষ্ট জগতের অনেকটা আমাদের অজ্ঞাত, পণ্ডিতেরা বলেন বেশীর ভাগই অজ্ঞাত; কিন্তু সৃষ্টিক্রিয়াটার সম্বন্ধে আমরা সকলেই সম্যক্‌রূপে প্রাজ্ঞ। বিধাতা-পুরুষ বোধ করি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুর কপালে লিখিবার সময়ই কোনরূপে এই জ্ঞানটা মস্তিষ্কের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেন। দুই একটা দুরন্ত ও অশিষ্ট লোক দেখা যায়, যাহারা এই সর্ব্বজনানুমোদিত তত্ত্বটা অজ্ঞেয় বলিতে চাহে। তাহারা নাস্তিক। বিজ্ঞের মতে তাহাদিগকে পোড়াইয়া মারাই যুক্তি।

প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্বগুলি ছাঁটিয়া কাটিয়া কতকটা এইরূপ দাঁড়ায়।

এক সময় ছিল, তখন কিছুই ছিল না; এই বৈচিত্র্যমণ্ডিত

অপূর্ব্বে জগৎ সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন ছিল। ছিল বোধ করি কেবল দেশ আর কাল ;—শূন্য দেশ আর শূন্য কাল ; আর ছিলেন সৃষ্টি-কর্ত্তা। সৃষ্টিকর্ত্তা নির্গুণ কি গুণময় তা' লইয়া যত ইচ্ছা তর্ক করিতে পার, কিন্তু একটা উপাধি তাঁহাতে বিদ্যমান স্বীকার করিতে হইবে ; নতুবা সৃষ্টিকল্পনা হয় না ; সেটা সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছা। স্রষ্টা ইচ্ছা করিলেন, জগৎ উৎপন্ন হউক ; আর জগতের সৃষ্টি হইল ; নাস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব হইল ; কিছুই ছিল না, সবই হইল ; দেশের ও কালের শূন্যত্ব পূর্ণ হইল। এই ঘটনার নাম সৃষ্টি ; স্রষ্টার ইচ্ছা হইতে ইহার উৎপত্তি ; ইহার পূর্ব্বে কি ছিল, কি হইত, জিজ্ঞাসা করিও না, উত্তর মিলিবে না ; ইহার পরে কি ঘটিয়াছে, কি ঘটিতেছে বা ঘটিবে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পার ; উত্তরপ্রাপ্তি দুরাশা নহে।

এই সৃষ্টিব্যাপার একমাত্র অসাধারণ ঘটনা ; জগতের ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই বা দ্বিতীয় নাই। একবারমাত্র কোন সময়ে ঘটিয়াছিল, এইপর্য্যন্ত আমরা জানি ; আর কখন ঘটিয়াছিল কি না, আর কখন ঘটিবে কি না তাহা জানি না ; জানিবার বোধ করি আবশ্যকতাও নাই।

তিনি ইচ্ছা করিলেন সৃষ্টি হউক, আর সৃষ্টি হইল ; বোধ করি এইপর্য্যন্ত বলিয়া নিরস্ত থাকিলে চলে না ; আর একটু বলা আবশ্যক। তিনি ইচ্ছা করিলেন সৃষ্টি হউক ; এবং তিনি ইচ্ছা করিলেন সৃষ্টি চলুক,—এই রূপে, এই ভাবে, এই পথে চলুক ; তাই জগৎযন্ত্র সেই রূপে, সেই ভাবে, সেই পথে চলিতে লাগিল। যিনি স্রষ্টা, তিনিই বিধাতা।

সৃষ্টিতত্ত্বরূপ মহাবৃক্ষের আগাছা পরগাছা, শাখাপল্লব ছাঁটিয়া কাটিয়া কেবল কাণ্ডটুকু বা মূলটুকু রাখিলে, উল্লিখিত কথা কয়টির

অধিক বেশী কিছু থাকে না। জগৎ আছে, স্রষ্টার ইচ্ছা; জগৎ চলিতেছে, বিধাতার বিধানে; এই কথা কয়টির উপর বড় বিবাদ বিসংবাদ নাই; একরকম ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু আরও অনেক কথা আছে, যাহা সর্ব্ববাদীসম্মত নহে।

কেহ বলেন, জগৎ বৃহৎ, প্রকাণ্ড, অসীম, অথচ কেমন সংযত, নিয়মিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ। সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান। সুদূর অতীতে ও সুদূর ভবিষ্যতে কেমন বাঁধা, সুতরাং বিধাতা সর্ব্বজ্ঞ।

কেহ বলেন,জগৎ কেমন সুন্দর; সুতরাং স্রষ্টাও সৌন্দর্য্যময়।

কেহ বলেন, জগৎ বড় সুখের; ঈশ্বর করুণাময়।

আবার কেহ বলেন, জগতে পুণ্যের জয়; অতএব ঈশ্বর ন্যায়ের নিদান। ইত্যাদি।

এইরূপে পাঁচজনে পাঁচকথা বলেন ও তুমুল কোলাহল করেন। পাঁচ ছয় হাজার বৎসর ধরিয়া কোলাহল চলিতেছে, কবে নিবৃত্ত হইবে বলা যায় না।

কেন না, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষ আসিয়া প্রশ্ন উত্থাপন করে; ঈশ্বর সৌন্দর্য্যময়, তবে জগতে কুৎসিতের অস্তিত্ব কেন? ঈশ্বর করুণাময়, তবে জগতে দুঃখ কেন? ঈশ্বর ন্যায়ের বিধাতা, তবে সীতার বনবাস কেন?

উত্তর, ও সব শয়তানের কাজ। শয়তান ঈশ্বরের বিরোধী, আহ্রিমান্ অহুর মজ্দের বিরোধী।

তবে কি ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান নহেন?

উত্তর, কেন শয়তান ত জব্দ আছে।

তার চেয়ে শয়তানের নিপাত হইলেই ত ভাল হইত।

উত্তর, ঈশ্বরের ইচ্ছা।

এ কেমন ইচ্ছা বলা যায় না। শয়তানটা বিধাতার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার এত চেষ্টা করিতেছে; তথাপি শক্তিসত্ত্বেও তাহার নিপাত করিব না, মন্দ ইচ্ছা নয়।

আর একরকম উত্তর আছে। তোমার সামান্য বুদ্ধিতে যাহা দুঃখ, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানে তাহা করুণা। তোমার বিকৃত দৃষ্টিতে যাহা কুৎসিত, বিধাতার নির্ম্মল দৃষ্টিতে তাহা সুন্দর। ধর্ম্মের লাঞ্ছনা লোকশিক্ষার্থ—ইহার ফল মঙ্গলময়।

নষ্টবুদ্ধির প্রশ্ন—আমার চক্ষুটা এমন বিকৃত করিল কে?

কূটবুদ্ধি দার্শনিক বলেন, কুৎসিত অস্বীকার করিলে সুন্দর থাকিবে না। দুঃখের অস্তিত্ব না মানিলে সুখের অস্তিত্ব থাকে না। যদি সুখ আছে মানিতে চাও, দুঃখ, প্রকৃত দুঃখ, মানিতে হইবে। বিধাতা যদি করুণাময় হন, তিনি দুঃখেরও নিদান।

বিজ্ঞানবিৎ বলিবেন, প্রকৃতিতে করুণা নাই। যা কিছু সুন্দর, যে একটু সুখ, দুঃখ হইতে তাহার উৎপত্তি; দুঃখেই বুঝি সমাপ্তি। ধর্ম্মের জয় মিথ্যা কথা; প্রকৃতির নিয়ম তাহা নহে। স্থূলদৃষ্টিতে বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের জয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের সমান গতি; উভয়েরই বিনাশ।

উত্তর বুঝি নাই। কেহ বলেন, চুপ কর, বিধাতার উদ্দেশ্য—Behind the veil. কেহ বলেন, তুমি নির্ব্বোধ। কেহ বলেন, দেখ দেখি, এ লোকটার কুম্ভীপাকের ভয় নাই। অপরে বলেন, আইস, ইহাকে পোড়াইয়া মারি। দার্শনিক মহাশয়ের অস্তিত্বকে নাস্তিত্বে মিশাই।

সুবোধ লোকে আসিয়া মীমাংসার চেষ্টা করে। ভাই, গণ্ড-গোলে দরকার নাই। ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা, সকলেই মানিয়া থাকি।

ঈশ্বর ইচ্ছাময়; তাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি কখন-না-কখন হইয়াছে। নতুবা এই এতবড় প্রকাণ্ড পদার্থ জগৎটা আসিল কোথা হইতে? তবে কোন্ সময়ে, কিরূপে, কেন, ইহার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বলিবার উপায় নাই। সে সব অজ্ঞেয়। ইচ্ছাময়ত্ব ছাড়িয়া দিলে ঈশ্বর নিরুপাধিক নির্গুণ বল ক্ষতি নাই; অজ্ঞেয় বল আরও ভাল। জগৎ একটা প্রকাণ্ড যন্ত্র, এই যন্ত্র-উদ্ভাবনে একজন যন্ত্রীর ইচ্ছা আবশ্যক; তাই ঈশ্বর-স্বীকার কর্ত্তব্য। এই যন্ত্রচালনেও একজন যন্ত্রীর শক্তি আবশ্যক। ঈশ্বরের ইচ্ছাই সেই শক্তি; তোমরা যাহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বল, তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছারই বিকাশমাত্র। যন্ত্রটা সুগঠিত, নিয়ন্ত্রিত, বেশ সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে; ইহা যন্ত্রীর মাহাত্ম্য। তবে মাঝে মাঝে মরীচা ধরিলে মেরামতের দরকার হয় কি না, তাহা লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে। সেই মেরামতের নাম মিরাকৃল্।

এই কথাগুলি শুনিতে বেশ, মীমাংসক মধ্যস্থের উপযুক্ত বটে। কিন্তু দুই একটা এমন উদ্ধতস্বভাব লোক দেখা যায়, তাহারা মধ্যস্থের কথায় ঘাড় পাতিতে চায় না। তাহারা বলে, যন্ত্র আছে সুতরাং যন্ত্রী আবশ্যক, অতএব ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা, এরূপ ন্যায় চলে না। ঘটের জন্য কুম্ভকার আবশ্যক; সুতরাং জগতের জন্য বিশ্বকর্ম্মার প্রয়োজন, যুক্তিটা ঠিক নহে। প্রথম, কুম্ভকার ঘট নির্ম্মাণ করে, মশলা হইতে বুদ্ধি যোগাইয়া গড়ে মাত্র; ঘটের উৎপাদন করে না। সেইরূপ প্রস্তুত মালমশলার উপর বুদ্ধিপ্রয়োগ করিয়া ঈশ্বর জগৎ গড়িয়াছেন, এইপর্যান্ত যুক্তিতে আইসে; সেই ব্রহ্মাণ্ড গড়িবার মশলা কোথা হইতে আসিল এ কথার উত্তর পাওয়া যায় না। কিছু-না হইতে কিছুর উৎপত্তি মানুষের জ্ঞানের

বাহিরে, তাহার কল্পনার অতীত। মেজর প্রেমিসের অভাব, সুতরাং সিদ্ধান্ত কিছুই আসে না। তবে বিশ্বাস কর, সে কথা স্বতন্ত্র; যুক্তির কথা তুলিও না।

মশলা কোথা হইতে আসিল ইহার উত্তর মিলিল না। তবে মশলা দেওয়া থাকিলে জগৎযন্ত্র নির্ম্মাণ হইল কিরূপে ইহা যুক্তির বিষয় হইতে পারে। ইহা বিজ্ঞানের বিষয়, বিজ্ঞানেরই বিচার্য্য; বিজ্ঞান কষ্টেসৃষ্টে যথাসম্ভব উত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছে। যাহাকে বিজ্ঞান প্রাকৃতিক নিয়ম বলে, যাহাকে তোমরা ইচ্ছার বিকাশ বলিতেছ, তাহারই দ্বারা জগতের নির্ম্মাণ-প্রণালী, ক্রিয়াপ্রণালী সঙ্গতভাবে বুঝিবার চেষ্টা হইতেছে, কতক কতক বুঝা যাইতেছে। কেন এমন হইতেছে একথার উত্তর মিলে না; তবে মনুষ্যের পক্ষে যে ভাবে বুঝা সাধ্য, যে ভাবে বুঝিলে মনুষ্যের মন তৃপ্তিলাভ করে, সেই ভাবের ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের নিকট মিলিতেছে। অন্য কোনরূপে বুঝিবার সাধ্য মনুষ্যের নাই; সে প্রয়াসও বিড়ম্বনা।

প্রাকৃতিক নিয়মকে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিকাশ বল বড় আপত্তি নাই; সে কেবল কথার মারপ্যাচ্। তবে "ঈশ্বরের ইচ্ছা"এই কথাটা কতকটা মনের চোখে ধূলি দেওয়া গোছ হয় এই আপত্তি। ইচ্ছা শব্দে মানুষের ইচ্ছা, কুকুরের ইচ্ছা, গোরুর ইচ্ছা, জীবজন্তুর ইচ্ছা, এইরকম একটা কিছু বুঝিতে পারা যায়। কাঠ পাতরের ইচ্ছা, কি অশরীরী কোন-কিছুর ইচ্ছা, আকাশ-কুসুমের মত নিরর্থক। ঈশ্বর শব্দে তোমরা অশরীরী সৃষ্টিছাড়া কোন একটা কিছু বুঝিয়া থাক। সেই ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিলে কি অর্থ বুঝিব, তাহা অভিধানেও লেখে না, বুদ্ধিতেও আইসে না। সুতরাং ঈশ্বরের ইচ্ছায় জগৎ এইরূপ হইয়াছে ও এইরূপে চলিতেছে, কথাটার

অর্থটা ভাল হৃদ্গত হয় না। ঈশ্বরেচ্ছা আমাদের অবোধগম্য বুদ্ধির অতীত একটা কিছু; অভিধানপ্রযুক্ত মানবেচ্ছার সহিত তাহার কোন সাদৃশ্য নাই। এরূপ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট থাকিতে ইচ্ছা হয়, নাচার।

ঈশ্বর এবং পরমাণু এই দুই মশলাতে স্থূলতর জগৎ নির্ম্মিত; প্রাকৃতিক নিয়মগুলি সমুদায় জানিলে কিরূপে জগৎ গঠিত হইয়াছে, কিরূপে চলিতেছে, ও কিরূপে চলিবে, বৈজ্ঞানিক তাহা বলিবার ভরসা করেন। ইহাকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলিতে পার। এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায়কগণের অন্যতম অগ্রণী মহামতি ক্লার্ক ম্যাক্সোয়েল একদা বলিয়াছিলেন, পরমাণুগুলি যেন ছাঁচে ঢালা; প্রাকৃতিক নিয়ম এখানে পরাহত; এইখানে একজন শিল্পীর আবশ্যকতা। মনুষ্যের বুদ্ধি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পথে অগ্রবর্ত্তী হইয়া যেখানেই কিয়ৎক্ষণের জন্য পরাবৃত্ত হইয়াছে, সেইখানেই হাল ছাড়িয়া নিরাশভাবে বলিয়াছে, এইখানে একজন শিল্পীর আবশ্যকতা। পরমাণুর গঠনে শিল্পীর আবশ্যকতা কি না, যাঁহারা মানববুদ্ধির বিজয়বৈজয়ন্তী বহন করিয়া সম্প্রতি অগ্রণী ম্যাক্সোয়েলের পদানুসরণ করিতেছেন, তাঁহারাই বোধ করি তাহার উত্তর দিবেন।

আর এক সম্প্রদায় আছেন তাঁহারা বলেন জগৎ ও ঈশ্বর অভিন্ন, জগৎছাড়া ঈশ্বরের কল্পনা দরকার নাই। জগৎ ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত, ঈশ্বরেরই মূর্ত্তি বা ঈশ্বরের অভিব্যক্তি। অবশ্য এই মতানুসারে সৃষ্টিশব্দের সার্থকতা নাই; সৃষ্টিব্যাপার বা ঘটনা বলিয়া কিছু কখন সংঘটিত হইয়াছিল এরূপ বুঝায় না। প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তে এই মত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের এই মত মজ্জাগত। এই সম্প্রদায়কে ইংরাজিতে

ফলতঃ Pantheists বলে; ইহাদিগকে নিরুত্তর করা বড়ই কঠিন, তবে গালি দেওয়া চলে।

মানবজাতি বহুদিন হইতে যে দৃঢ়ভিত্তি সংস্কার পোষণ করিয়া আসিতেছে, তাহার মূলোচ্ছেদ সহজ ব্যাপার নহে। আমাদের বিশ্বাস, জগৎ নামে একটা বিচিত্র অসীম অনন্ত প্রকাণ্ড পদার্থ অনন্ত দেশ ব্যাপিয়া এবং বোধ করি অনাদি কাল ব্যাপিয়া বর্ত্তমান আছে। মনুষ্য সেই জগতের একটি ক্ষুদ্র অংশ; তাহার খানিকটা-মাত্র দেখিতে পায় ও কিছুক্ষণমাত্র ধরিয়া দেখে। জ্ঞানের বিকাশ ও উন্নতির সহিত সেই অসীম জগতের পরিচিত অংশের পরিধি-টুকু ক্রমে প্রসার লাভ করে বটে; কিন্তু অসীমের তুলনায় তাহার পরিমাণ সর্ব্বদাই এবং সর্ব্বতোভাবে নগণ্য। সম্প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের অতি সংকীর্ণ অংশে আমাদের জ্ঞান আবদ্ধ আছে; কিন্তু এই পরিধির বাহিরে আরও সর্ব্বতোভাবে বিশালতর যে অংশ রহিয়াছে, তাহার কিয়দংশের সহিত ক্রমশঃ আমাদের চেনাশুনা ঘটিতে পারে; কিন্তু সমগ্রটা কখনই জ্ঞানের সীমানার ভিতর আসিবে না। এই প্রকাণ্ড পদার্থটা একটা প্রকাণ্ড জটিল যন্ত্র-বিশেষ; তবে যতই আমরা ইহার সহিত পরিচিত হই, ততই ইহার জটিলতা মুক্ত হয়; ততই আমরা দেখিতে পাই কতক-গুলি সুসঙ্গত নিয়মের শৃঙ্খলায় সমুদায় চাকাগুলি পরস্পরকে সংবত ও নিয়ন্ত্রিত রাখিয়াছে; এই প্রাকৃতিক নিয়মগুলি জ্ঞানায়ত্ত করিতে পারিলেই জগৎযন্ত্রের জটিলতা ক্রমশঃ পরিষ্কার হইয়া আসিবে। এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রের এইমাত্র সম্পাদ্য।

একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে এই মতটা অনেকখানি বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। আমার ভিন্ন আর কিছুর অস্তিত্ব যুক্তি দ্বারা ঠিক্ প্রতিপন্ন হয় না। আমি আছি, এটা যেমন প্রমাণনিরপেক্ষ

সত্য; আর কিছু আছে, তাহা ঠিক্ তেমন সত্য নহে; এবং তাহার প্রমাণ খুঁজিয়া মিলে না।

সাংখ্যদর্শন পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; এবং পুরুষপ্রকৃতির সমবায়ে বা সাক্ষাৎকারে ব্যক্ত জগতের অভিব্যক্তি সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতির অস্তিত্ব একটা Hypothesis মাত্র; এই Hypothesis বা অনুমিতি ব্যতীতও যদি জগতের অভিব্যক্তি বুঝা যায়, তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতে সকলে সম্মত না হইতে পারেন। প্রাচীনের মধ্যে বৈদান্তিক ইহা স্বীকার করিতেন না; আধুনিকের মধ্যে ক্লিফোর্ড প্রভৃতি ইহা স্বীকার করেন না। আমি জগতের অংশ, ততদূর সত্য নহে, জগৎ আমার অংশ একথাটা যতদূর। জগৎ না থাকিলে আমি থাকিতাম না, বোধ করি নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে না; কিন্তু আমি না থাকিলে জগৎ থাকিত না এটা বোধ হয় কতকটা সাহসের সহিত বলিতে পারি। ব্যক্ত জগতের আমা ছাড়িয়া স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ভাল প্রমাণ করা যায় না। উহা আমারই নিজের অংশ, বা ছায়া বা সমীপস্থ প্রতিমূর্ত্তি। জ্ঞান-বিস্তারের সহিত জগতের একটু, আর একটু, আর একটুর সহিত ক্রমশঃ আমার পরিচয় হইতেছে, ইহা সম্পূর্ণ ঠিক্ নহে; আমারই আমিত্বের বা চৈতন্যের বিকাশের সহিত আমার জগৎ ক্রমে সৃষ্টি, বিকাশ বা অভিব্যক্তি লাভ করিতেছে, বরং ঠিক্।

কতকগুলি, সংখ্যাতীত কি না ঠিক্ জানি না, চিৎপদার্থ বা চৈতন্যকণার সমবায়ে আমার চৈতন্য। চৈতন্যের একটি বিশেষ শক্তি আছে, সে আপনার সমগ্রটাকে, অর্থাৎ সমুদায় ব্যষ্টিভূত চৈতন্যকণার প্রবাহটাকে, একভাবে দেখিতে পায়,

আপনাকে আপনি চিনিয়া লয়; ইহা হইতেই আমি-জ্ঞানের উৎপত্তি। দ্বিতীয়তঃ ইহা আপনার অংশীভূত বা উপাদান-স্বরূপ চৈতন্যকণাগুলিকে এক এক করিয়া, খুঁটনাটি করিয়া, বাছিয়া, গোছাইয়া সাজাইয়া দেখিতে চায়; আপনাকে আপনি বিশ্লেষণ করে; এই বিশ্লেষণ-চেষ্টায় চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ, আমার জ্ঞান বুদ্ধি বাসনা প্রভৃতির উৎপত্তি। বৈদান্তিকেরা আত্মার বিকাশের তিনটা অবস্থার উল্লেখ করেন;—সুষুপ্তাবস্থা, স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রদবস্থা। প্রথম সুষুপ্তাবস্থায় চৈতন্যের এই আত্মবিশ্লেষণশক্তি জন্মে নাই; চৈতন্য হয় ত আছে কিন্তু আপনার নিকট অপরিচিত; এখনও নিজের কি আছে, কি নাই জানে না। দ্বিতীয় স্বপ্নাবস্থায় চৈতন্যের কিছু বিকাশ হইয়াছে; আপনার কতক কতক আপনার বলিয়া জানিয়াছে; কিন্তু এখনও সাজাইয়া গোছাইয়া লইতে পারে নাই; কাহার সহিত কি সম্বন্ধ ঠিক্ করিতে পারে নাই; এবং বোধ করি আপনার অস্তিত্বের প্রবাহ সম্বন্ধে এখনও আপনি সন্দিহান। জাগ্রদ-বস্থায় চৈতন্য বিকশিত, স্ফুট, স্ফূর্ত্তিমান্; আপনাকে জানে, আপনার সকলকে চিনে; কোন্ অনুভূতিটা কোন্ স্মৃতিকে উদ্বোধিত করিতেছে, কোন্ স্মৃতি কোন্ আকাঙ্ক্ষাকে জাগাইতেছে, এবং সে নিজে সেই অনুভূতিটা, স্মৃতিটা, আকাঙ্ক্ষাটাকে লইয়া কি করিবে, কোথায় রাখিবে, ইত্যাদি লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত রহিয়াছে। সহজ কথায় বুঝাইতে হইলে প্রোটোপ্লাজ্‌মের চৈতন্যকে বোধ করি সুষুপ্ত, জলৌকা বা কিঞ্চিলিকার চৈতন্যকে স্বপ্নাবস্থ, ও উচ্চতর জীবের চৈতন্যকে জাগ্রৎ বলিতে পারা যায়। প্রোটোপ্লাজ্‌মের কাছে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে কি না সন্দেহ; জলৌকার জগৎ অসম্বদ্ধ, অনিয়মিত, ব্যবস্থাহীন;

আর তোমার আমার জগৎ অনেকাংশে সুবদ্ধ, সুগ্রথিত, সুসংযত, সুব্যবস্থ, বিকশিত ও বিকাশমান।

এইরূপ চৈতন্যের আত্মবিশ্লেষণ-শক্তি। সে আপনাকে বিশ্লিষ্ট, বিভিন্ন, ছিন্ন করিয়া দুইভাগে রাখে, একভাগের নাম দেয় আত্মা, আপনি বা আমিপ্রপার; আর একভাগের নাম দেয় প্রকৃতি বা ব্যক্ত প্রকৃতি, জগৎ অথবা ব্যক্ত বাহ্য বা আমিছাড়া জগৎ। এবং এই দুইএর পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত সম্বন্ধনির্ণয় লইয়া আপনাকে ব্যতিব্যস্ত রাখিয়া কৌতুক করে। যে চিৎপদার্থগুলির সমবায়কে আত্ম হইতে পৃথক্‌ভাবে দেখিয়া ব্যক্ত প্রকৃতি নাম দেয়, তাহাদিগকে আবার দুইরকমে সাজাইয়া দেখে। চৈতন্য যে, জাগ্রদবস্থাতেও সমুদায় চিৎকণাগুলি দেখিতে পায় এমন নহে; কতকগুলিমাত্র দেখে ও সাজায় ও গোছায়; ও তাহাদের দুইরকমে সাজায় ও দুইভাবে গোছায়। একরকমে গোছানর নাম দেশব্যাপ্তি, আর একরকমে গোছানর নাম কালব্যাপ্তি। কতকগুলা একসঙ্গে দেখে, কতকগুলা পর পর দেখে; অথবা একরকমে দেখার নাম একসঙ্গে, দেশে, যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া দেখা, আর একরকম দেখার নাম পর পর, কালে, যথাকালে বিন্যস্ত করিয়া দেখা। তৃতীয় কোনরকমে দেখে না কেন তাহার উত্তর নাই।

সুতরাং দেশ ও কাল চৈতন্যের ধর্ম্ম বা শক্তি, অথবা চৈতন্যের আত্মনিরীক্ষণের রীতি। যে অর্থে আমার বাহিরে অন্য জগৎ নাই, সেই অর্থে আমার বাহিরে দেশ নাই বা কাল নাই। আমিই আমার অনুভূতিগুলিকে আমারই আবিষ্কৃত উপায়ে দেশে স্থাপিত করি ও কালে বিন্যস্ত করি; সব অনুভূতিগুলিকে নহে, কতকগুলিকে মাত্র; কেন না, আমার চৈতন্য এখনও পূর্ণ-

বিকাশ লাভ করে নাই, পূর্ণ জাগ্রত হয় নাই। সাজান ও গোছানর দিকেই আমার প্রয়াস, এবং সেই প্রয়াসেই চৈতন্যের বিকাশ। প্রয়াসে শক্তিসঞ্চয় ও শ্রমসংক্ষেপের প্রবল চেষ্টা। সব অনুভূতিগুলি ত চিনি না, যাহাদিগকে চিনি, তাদের মধ্যেও আবার সাজাইবার সময় বাছিয়া লই। সাজাইবার সময় কতকগুলিকে ডাকিয়া লই, কতকগুলিকে অনাদরে পরিত্যাগ করি। আবার মনের মত করিয়া সাজাই। পরস্পর সুনিয়ত একটি শৃঙ্খলা ও সম্বন্ধ রাখিয়া সাজাই। যেন যখন যাহাকে দরকার হয়, তখনি তাহাকে ডাকিয়া পাই; যেন তূর্য্যধ্বনির সঙ্কেত শুনিতে শুনিতে সকলে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থলে সুসম্বদ্ধ, সুবিন্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া যায়; যেন বৃহৎরচনার পরিশ্রমেই ক্লান্তিবোধ না হয়; যেন বৃহৎরচনা হইতে হইতেই যুদ্ধে হটিতে না হয়। দেশে সাজাই ও কালে সাজাই; এবং উভয়ের মধ্যে এমনি সুবিহিত ব্যবস্থা করিয়া সাজাই। এই ব্যবস্থা আমার চৈতন্যের কারিগরী, এবং এই ব্যবস্থার নাম প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রকৃতিতে, বহিঃপ্রকৃতিতে, নিয়মের শৃঙ্খলা কেন, জগৎ নিয়মতন্ত্র রাজ্য কেন? কেন না, আমিই নিয়মের প্রতিষ্ঠাতা। নিয়মের প্রতিষ্ঠাতে আমার চৈতন্যের শ্রমসংক্ষেপ, চৈতন্যের বিকাশ ও পূর্ণতার দিকে গতি; আমার জীবনসংগ্রামে জয়লাভের ভরসা। তাই আমি আমার জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। তাই আমার জগতে নিয়মবশে পৃথিবী ঘুরে, বাতাস বহে, আলো জ্বলে। তাই আমার জগৎ ছন্দোবদ্ধ সুললিত গীতিকবিতা, পঠনে প্রাঞ্জল, শ্রবণে মধুবর্ষী।

নিয়মের প্রতিষ্ঠায় আমার চৈতন্যের বিকাশ ও জ্ঞানের প্রসার; তাই নিয়মের প্রতিষ্ঠাতেই আমার আনন্দ ও শান্তি;

নিয়মের প্রতিষ্ঠাই আমার স্বভাব। যাহা নিয়মের ভিতরে এখনও আইসে নাই, তাহা আমার কেমন-কেমন অসঙ্গত ঠেকে; তাহাকে নিয়মের অধীনে আনিবার জন্যই আমার চেষ্টা। সর্ব্বত্র যে কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা নহে; তবে সফলতা ধরিয়া আমার আত্মবিকাশের পরিমাণ। আমার জগতে আমি নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি; ক্ষুধা পাইলে আমি খাই ও আমার জগতে অহোরাত্রি পর্য্যায়ক্রমে ঘটে। ঐ ব্যক্তি যাহাকে পাগল বলা যায়, উহার জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা হয় নাই; ও ক্ষুধা পাইলে খায় না এবং উহার নিকট বোধ করি দিনের পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিন ঘটে না। উহারও একটা জগৎ আছে, কিন্তু সেটা আমার জগতের মত সুনিয়ত নহে; সেটা এলোমেলো অসংযত অযথান্যস্ত।

সুতরাং প্রকৃতি যেমন আমারই অন্তরে, প্রকৃতির দেশব্যাপ্তি ও কালব্যাপ্তি তেমনি আমারই অন্তরে, এবং প্রকৃতিতে নিয়মের শৃঙ্খলা তেমনি আমারই সৃষ্টি। অনন্ত জগৎ অর্থহীন, অনাদি কাল অর্থহীন, অসীম দেশ অর্থহীন। আমার আত্মবিকাশের সহিত আমার জগতের পরিধি বাড়িতেছে, দেশের সীমারেখা ও কালের সীমারেখা সরিয়া যাইতেছে। জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা দূরীকৃত হইতেছে। যাহার নিকট নিয়মের প্রতিষ্ঠা, তাহার আত্মা সুস্থ, বলিষ্ঠ, ও সামর্থ্যবান্। যাহার নিকট নিয়মের প্রতিষ্ঠা নাই, সে বাতুল বা পাগল।

আমার এই অভিব্যক্তির নাম প্রাকৃতিক সৃষ্টি। সুস্থ মানবাত্মা আর দ্বিতীয় সৃষ্টির বিষয় অবগত নহে। *

পৃথিবীর ইতিহাসে কেবল একমাত্র জাতির মধ্যে এই সৃষ্টিতত্ত্ব

* সম্প্রতি শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় দার্শনিক সৃষ্টি অভিধানে এই সৃষ্টিতত্ত্ব বঙ্গীয় পাঠকের নিকট উপস্থিত করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

আবিষ্কৃত হইয়াছিল। জ্ঞানের ইতিহাসে সেই জাতির প্রতিভার জ্যোতিঃ নির্ম্মল প্রভা বিস্তার করিতেছে।

কোহিনুর।

হীরকের মধ্যে কোহিনুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেইজন্যই বোধ হয় অনেকে পুরাণাদি-বর্ণিত কোন কোন শ্রেষ্ঠ রত্নের আসনে কোহি-নুরকে বসাইয়া থাকেন; কিন্তু কোহিনুরের প্রকৃত তত্ত্ব দুইজন প্রসিদ্ধ বৈদেশিকের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিতে পারা যায়। এই দুইজনের একজনের নাম ট্যাভারনিয়ার, অন্যের নাম বর্ণিয়ার। বর্ণিয়ার অনেকদিন পর্য্যন্ত মোগল রাজসভায় চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত ছিলেন; তিনি কোহিনুর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে জানিতে পারা যায় যে, মীরজুম্‌লা যখন প্রথম সাজাহা-নের সেনাপতিত্বে নিয়োজিত হন সেই সময় তিনি এই অদ্বিতীয় রত্ন দিল্লীশ্বরকে উপহার প্রদান করেন। সম্রাটের কার্য্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে মীরজুম্‌লা গোলকণ্ডাধিপতির সেনানায়ক ছিলেন এবং তিনি গোলকণ্ডায় অবস্থানকালে কোহিনুর হস্তগত করিয়া-ছিলেন।

কিন্তু ট্যাভারনিয়ারের গ্রন্থ হইতে আমরা কোহিনুরের বিস্তৃত-তর ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারি। ট্যাভারনিয়ার পর্য্যটনোপ-লক্ষে এসিয়াখণ্ডে ছয়বার আসিয়া, এই প্রাচ্য ভূখণ্ডে প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল বাস করিয়াছিলেন; তিনি নিজে একজন মণিকার

ছিলেন, এবং এইজন্যই বোধ হয় তিনি কোহিনুর সম্বন্ধে অধিক কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার গ্রন্থের চারিটী বিভিন্ন অংশে কোহিনুরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এইসকল বর্ণনার ভিতর স্থানে স্থানে এতৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ লক্ষিত হয়; তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন, কুলুরের এক খনিতে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং পরিষ্কৃত মার্জ্জিত হইবার পূর্ব্বে ইহার পরিমাণ এক হাজার সত্তর রতি ছিল। মীরজুম্‌লা সর্ব্বপ্রথমে ইহা আরঙ্গেব বাদসাহকে উপহার প্রদান করেন। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক এই বর্ণনাকে ট্যাভারনিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্ত-সংকলয়িতার প্রক্ষিপ্ত প্রয়োগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; কারণ, এই বর্ণনার সহিত তাঁহার পরবর্ত্তী বর্ণনার যথেষ্ট অনৈক্য দেখা যায়। ট্যাভারনিয়ারের এই ভ্রমণবৃত্তান্ত-সঙ্কলয়িতার নাম চাপ্যুজোঁ; ট্যাভারনিয়ারের পর্য্যটন-কাহিনী প্রথম প্রকাশিত হইবার পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে, যখন তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন, সেই সময় চাপ্যুজোঁ "হিস্‌টোরি ডি যোয়ঁ" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত করেন; এই পুস্তকে ট্যাভারনিয়ারের ডায়ারি এবং পত্র হইতে অনেক সার সঙ্কলিত হয়।

কিন্তু ট্যাভারনিয়ারের অন্যান্য বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে মীরজুম্‌লা সাজাহানকে কোহিনুর উপহার দিয়াছিলেন। কোহিনুরকে ব্যবহারোপযোগী করিবার পূর্ব্বে ইহার পরিমাণ নয়শত রতি ছিল। এই সময় মোগল রাজপরিবারে একজন ইটালীয় মণিকার কাজ করিতেন, তাঁহার বাসস্থান ভিনিসে, নাম হর্টেন্সিও বার্জ্জিও—কর্ত্তনপূর্ব্বক কোহিনুরকে সুন্দর ও ব্যবহারোপযোগী করিবার ভার ইহাঁরই উপর অর্পিত

হয়। কিন্তু তিনি কোহিনূরের এত অধিক অংশ অপচয় করেন যে, তাঁহার কবল হইতে উদ্ধার হইলে কোহিনূরের পরিমাণ ৩১৯$\frac{1}{2}$ রতিতে পরিণত হয়। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে ট্যাভারনিয়ার আগ্রার সম্রাট আরঙ্গেবের নিকট কোহিনূর দেখিয়াছিলেন; আরঙ্গেব তাঁহার বৃদ্ধ পিতা সাজাহানকে কারাবদ্ধ করিয়া অন্যান্য বহুমূল্য রত্নাদির সহিত কোহিনূরও হস্তগত করেন। এ সময়েও কোহি-নূরের ওজন ৩১৯$\frac{1}{2}$ রতি ছিল।

"মেময়রর্স্ অব্ বাবর" নামক গ্রন্থে একখানি অত্যুজ্জল বহু-মূল্যবান হীরকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; কেহ কেহ অনুমান করেন এই হীরক কোহিনূর; কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানে অবগত হইতে পারা যায় যে, ইহা কোহিনূর নহে। সাজাহানের পূর্ব্বে কোহিনূর দিল্লির মোগল সম্রাটদিগের হস্তগত হয় নাই। বাবর তাঁহার আত্মজীবনবৃত্তান্তে যে হীরকের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা তাঁহার পুত্র হুমায়ুন ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে রাজা বিক্রমজিতের নিকট হইতে লাভ করিয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন; ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদীর সাহ কর্তৃক দিল্লি লুণ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহা মোগল রাজপ্রাসাদেই রক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু ট্যাভারনিয়ার আরেঙ্গেবের যে সকল হীরকরত্নাদি দেখিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে এই হীরকখণ্ড ছিল না। এজন্য অনুমান হয় যে, তখন পর্য্যন্ত তাহা কারাবদ্ধ বৃদ্ধ সম্রাট সাজাহানের নিকটেই ছিল। এই হীরক কোহিনূরের সমপরিমাণ হইলেও অন্য কোন বিষয়ে কোহিনূরের সহিত ইহার সাদৃশ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। বাবরের গ্রন্থে এবং ফেরিস্তায় এই হীরক ওজনে প্রায় ২২১ রতি এইরূপ লেখা আছে; ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে কোহিনূর যখন ইংলণ্ডে নীত হয় তখন ইহার পরিমাণও এইপ্রকার ছিল।

ম্যাল্‌কল্‌ম্ নামক একজন পর্য্যটক ১৮১০ খৃষ্টাব্দে পারস্যের অধিপতির নিকট একখণ্ড হীরক দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন ইহাও ওজনে প্রায় ২২১ রত্তি। এই হীরকখণ্ডের নাম "দরিয়াইনুর," অর্থাৎ "জ্যোতিঃ-সমুদ্র"; শুনিতে পাওয়া যায় নাদীর সাহ দিল্লি লুণ্ঠন করিয়া অন্যান্য মণিমুক্তার সহিত এই হীরকখণ্ডও পারস্যে লইয়া গিয়াছিলেন। অতএব বাবরের গ্রন্থে ও ফেরিস্তায় যে হীরকের উল্লেখ দেখা যায় তাহা ইহাই হওয়াই সম্ভব।

যাহা হউক, মোগলহস্তচ্যুত হওয়ার পর ইংরাজের হস্তগত হওয়া পর্য্যন্ত কোহিনূরের ইতিহাস অতি কৌতুকজনক। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ সা দিল্লির সম্রাট, পরাক্রান্ত আকবর ও আরঙ্গেবের নিস্তেজ বংশধর, বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর জীর্ণ রাজদণ্ডহস্তে অবস্থিত। নাদীর সাহ তাঁহার দুর্ব্বল হস্ত হইতে কোহিনূর কাড়িয়া লইলেন; প্রায় আশী কোটী টাকা মূল্যের ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া নাদীর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন—ভারতের গৌরব কোহিনূরও পারস্যে নীত হইল।

নাদীর সাহের হস্তগত হইবার পূর্ব্বে কোহিনূরের কি নাম ছিল তাহা জানা যায় না; নাদীর সাহ ইহার অত্যুজ্জল জ্যোতিঃ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ইহার "কো-ই-নুর" (কো = পর্ব্বত, নূর = জ্যোতিঃ) আলোক-শৈল বা জ্যোতিঃশৈল এই আখ্যা প্রদান করেন। ট্যাভারনিয়ার বলেন যে, ইহার কোহিনূর নাম অতি উপযুক্তই হইয়াছিল। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে নাদীর সা খোরাসানে নিহত হন। নাদীরের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র সা রুক্ষ পারস্যের সিংহাসন ও কোহিনূরের উত্তরাধিকার লাভ করেন, কিন্তু সিংহাসনপ্রাপ্তির অল্পকাল পরেই তিনি আগা মহম্মদ নামক একজন প্রধান অমাত্য কর্ত্তৃক পদচ্যুত ও কারাবদ্ধ হন। আগা মহম্মদ তাঁহার

নিকট হইতে কোহিনূর হস্তগত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; এমন কি, এজন্য তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়নও সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু আগা মহম্মদ কোহিনূরলাভে কৃতকার্য্য হন নাই। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে নাদীরের জনৈক সেনাপতি আহম্মদ সা সারুক্ষের বিশেষ সহায়তা করিয়া পুরস্কারস্বরূপ কোহিনূর উপহার প্রাপ্ত হন। এই আহম্মদ সা অতঃপর কাবুলে দুরাণী বংশ সংস্থাপিত করেন।

আহম্মদ সার হস্ত হইতে কোহিনূর তৎপুত্র টাইমুরের হস্তগত হয়, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জেমান সা কোহিনূর লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু অল্পদিন পরেই জেমান সা তাঁহার ভ্রাতা মহম্মদ কর্তৃক কারারুদ্ধ ও অন্ধ হন, তথাপি কোহিনূর তাঁহার হস্তচ্যুত হয় নাই। দুইবৎসর পরে তিনি তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা সুলতান সুজাকে ইহা প্রদান করেন। কিন্তু সুবিখ্যাত ইতিহাস-লেখক এলফিন্‌ষ্টোন্ ও প্রিন্সেপ সাহেব বলেন যে, সা জেমান যে গৃহে অবরুদ্ধ ছিলেন সেই গৃহভিত্তিতেই অন্যান্য রত্নাদির সহিত কোহিনূরও প্রোথিত ছিল। যাহা হউক, যে কোন উপায়ে কোহিনূর সুজার হস্তগত হইয়াছিল; কারণ, সুজা তাঁহার ভ্রাতা মহম্মদকে সিংহাসনচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া রাজ্য অধিকার করিবার পর ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত এলফিন্‌ষ্টোন্ সাহেবের পেশোয়ারে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেই সময় এলফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব সা সুজাকে এই হীরক ব্যবহার করিতে দেখিয়াছিলেন। এলফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব তাঁহার পুস্তকে ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, ট্যাভারনিয়ার মোগল রাজদরবারে যে হীরক দেখিয়াছিলেন তাহার বর্ণনার সহিত সা সুজার ব্যবহৃত হীরকের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল। ইহার অল্পদিন পরে মহম্মদ কৌশলক্রমে কারাগার

হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক সা সুজাকে বন্দী করেন, কিন্তু সুজা ১৮১২ খৃষ্টাব্দে লাহোরে পলায়ন করিয়া পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎসিংহের শরণাপন্ন হন। কোহিনূর তখনো তাঁহার নিকটে ছিল।

রণজিৎসিংহ জানিতে পারিলেন কোহিনূর সুজার নিকট আছে। সুজা তখন রণজিতের আশ্রিত; বলপূর্ব্বক কোহিনূর গ্রহণ করা রণজিত ন্যায়সঙ্গত মনে করিলেন না—সুজাকে সাহায্য করিবেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহার প্রচুর উপকার করিবেন আশা দিয়া তাঁহার নিকট কোহিনূর প্রার্থনা করিলেন। সুজা তখন প্রবাসী, পরান্নভোজী ভিক্ষুক, তথাপি জগতের শ্রেষ্ঠ রত্নে তাঁহার গৌরবহীন মুকুট সমুজ্জ্বল। তিনি রণজিতকে বলিয়া পাঠাইলেন কোহিনূর তাঁহার নিকট নাই, হারাইয়া গিয়াছে। সা সুজার এ ছলনা বুঝিতে একচক্ষু ধূর্ত্ত পাঞ্জাবপতির কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না; বিনামূল্যে কোহিনূর লাভে বিফলমনোরথ হইয়া তিনি মূল্য দিয়া তাহা ক্রয় করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু কোহি-নূর যে তাঁহার কাছে আছে সুজা একথা কিছুতেই স্বীকার করিলেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া পঞ্চনদের অধীশ্বর অন্য একটি ছলনা অবলম্বন করিলেন, তিনি একদিন সহসা সুজার নিকট উপস্থিত হইলেন, উভয়ের মধ্যে বন্ধুতা স্থাপিত হইল—বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ রণজিৎ পরস্পরের রাজমুকুট পরিবর্ত্তন করি-লেন; সুজার মুকুটে কোহিনূর ছিল, রণজিতের হস্তগত হইল। অনন্তর মহারাজা সা সুজার জীবিকানির্ব্বাহের জন্য পাঞ্জাবে একটি বৃহৎ জায়গীর প্রদান করিলেন এবং কাবুলজয়ে সাহায্য করিবেন এরূপ আশাও দিলেন। এই ঘটনা ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ঘটে। কিন্তু সেই পর্ব্বতবাসী, স্বাধীনচেতা রাজকুমার পঞ্চনদের এই

সমতল প্রদেশে দীর্ঘকাল সন্তুষ্টচিত্তে পরপ্রসাদ ভোগ করিতে সক্ষম হইলেন না; লাহোর ত্যাগ করিয়া অনেক দুর্গম অরণ্য ও পর্ব্বত পরিভ্রমণপূর্ব্বক অবশেষে লুধিয়ানায় উপস্থিত হইলেন। এখানে ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী তাঁহাকে ও তাঁহার ভ্রাতা অন্ধ জেমান সাকে (জেমান সা পূর্ব্ব হইতেই সা সুজার সঙ্গে ছিলেন) পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং গবর্মেণ্ট হইতে প্রত্যেককে বার্ষিক ৬০০০০৲ টাকা পেন্সন্ ধার্য্য করিয়া দিলেন। স্লিম্যান সাহেব বলেন যে, জেনারাল স্মিথ এই সময় লুধিয়ানার সেনানায়ক ছিলেন; লুধিয়ানার অবস্থানকালে বৃদ্ধ জেমান সা জেনারেল স্মিথের নিকট এই সমস্ত বিবৃত করিয়াছিলেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড অকৃলণ্ড সা সুজাকে কাবুলের সিংহাসন প্রদান করেন।

দিল্লী ও কাবুলের জহরীগণ এবং অন্যান্য অনেকে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, রণজিৎ সিংহ সা সুজার নিকট যে হীরক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা যে ট্যাভারনিয়ারের বর্ণিত হীরক, অর্থাৎ কোহিনূর, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি ট্যাভারনিয়ার যখন আগ্রায় কোহিনূর দেখিয়াছিলেন তখন ইহার পরিমাণ ৩১৯½ রতি ছিল, কিন্তু রণজিৎসিংহের হস্তগত হওয়ার পর দেখা যায় কোহিনূর ওজনে ২২১½ রতি মাত্র। মধ্যে হইতে ৯৮ রতি কোথায় উড়িয়া গেল তাহা নির্ণয় করা দুরূহ।

মহারাজ রণজিৎসিংহ যতদিন জীবিত ছিলেন, রাজদরবারে উপস্থিত হইবার সময় কিম্বা কোন উৎসব উপলক্ষে কোহিনূর ধারণ করিতেন; অনেক ইংরাজ লেখক তাঁহাকে কোহিনূর-ভূষিত দেখিয়াছেন।

কোহিনূরের উজ্জ্বলতা সম্বন্ধে কেহ কেহ বিভিন্ন মতও

প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মিস্ এডেন নামক একজন ইংরাজ লেখিকা তাঁহার স্বরচিত "Portraits of the Princes and People of India" নামক পুস্তকে কোহিনূরের এক প্রতিকৃতি প্রকাশ করিয়াছেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে রণজিতের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যেন কোহিনূর পুরুষোত্তমে জগন্নাথদেবকে উপহার পাঠান হয়, কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় পূর্ণ হয় নাই; রণজিতের মৃত্যুর পর কোহিনূর তাঁহার ধনাগারে রক্ষিত হইয়াছিল।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইলে কোহিনূর অন্যান্য রত্নাদির সহিত "বোর্ড অব গবর্মেণ্টে"র হস্তগত হয়। ইহার ছয় সপ্তাহ পরে তদানীন্তন গবর্ণর জেনারাল লর্ড ডালহাউসীর পরামর্শমত তাহা ইংলণ্ডে ভারতেশ্বরীর নিকট প্রেরিত হয়। ভারতের কোহিনূর ভারতেশ্বরীর রাজমুকুট উজ্জ্বল করিতেছে।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যে প্রদর্শনীর অধিবেশন হয় তাহাতে কোহিনূর প্রদর্শিত হইয়াছিল। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে মহারাণীর জহরী মেসার্স গেরাণ্ডস্ কোম্পানী আমষ্টারডাম্ হইতে উরসেঞ্জার নামক একজন প্রসিদ্ধ মণিকারকে আনাইয়া সুগঠিত করিয়া কর্ত্তন করিবার জন্য তাঁহার হস্তে কোহিনূর প্রদান করেন। কোহিনূরকে কাটিয়া সুগঠন করিতে ৩৮ দিন লাগিয়াছিল এবং এই কার্য্যের জন্য প্রায় লক্ষ টাকা মজুরী দিতে হইয়াছিল। কোহিনূর আকারে এখন আর কোহিনূর নাই—কোহিনূর-কণায় পরিণত হইয়াছে; এখন ইহার পরিমাণ ৬৩ রতি মাত্র। কোথায় নয়শত রতি আর কোথায় তেষট্টি রতি!

কোহিনূরের মূল্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। যখন ইহা রণজিৎসিংহের নিকট ছিল তখন

বিভিন্ন জহরীতে ইহার মূল্য ত্রিশ লক্ষ হইতে এক কোটী টাকা স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার প্রকৃত মূল্য কত তাহা আজও স্থির হয় নাই। এ পর্য্যন্ত অনেক হস্তে কোহিনূর ঘুরিয়াছে কিন্তু কেহ মূল্য দিয়া কিনিয়াছেন এরূপ উল্লেখ দেখা যায় না, তাই বুঝি রণজিৎ উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন, ইহার মূল্য পাঁচ জুতা।

ময়ূরসিংহাসন এবং কোহিনূর ভারতের গৌরব, কিন্তু উভয়েই দেশান্তরিত হইয়াছে; কেবল তাহাদের বিস্ময়কর কাহিনী ভারতের বিপুল বক্ষে পড়িয়া পথিকের মানসনয়নে অতীতের ইন্দ্রজাল ফুটাইয়া তুলিতেছে।

তুলনায় সমালোচনা।

একদা পুলকে প্রভাত আলোকে
গাহিছে পাখী;
কহে কণ্টক বাঁকা কটাক্ষে
কুসুমে ডাকি';—
তুমি ত কোমল বিলাসী কমল,
দুলায় বায়ু,
দিনের কিরণ ফুরাতে ফুরাতে
ফুরায় আয়ু;
এ পাশে মধুপ মধুমদে ভোর,
ও পাশে পবন পরিমল-চোর,
বনের দুলাল, হাসি পায় তোর
আদর দেখে'!

আহা মরি মরি কি রঙীন্ বেশ,
সোহাগ হাসির নাহি আর শেষ,
সারাবেলা ধরি রসালসাবেশ
গন্ধ মেখে'!
হায় ক'দিনের আদর সোহাগ
সাধের খেলা!
ললিত মাধুরী, রঙীন্ বিলাস,
মধুপ-মেলা!

ওগো নহি আমি তোদের মতন
সুখের প্রাণী,
হাব ভাব হাস, নানা-রঙা বাস
নাহিক জানি!
রয়েছি নগ্ন, জগতে লগ্ন
আপন বলে,
কে পারে তাড়াতে আমারে মাড়াতে
ধরণী তলে!
তোদের মতন নহি নিমেষের,
আমি এ নিখিলে চির-দিবসের,
বৃষ্টিবাদল ঝড়বাতাসের
না রাখি ভয়!
সতত একাকী, সঙ্গীবিহীন,
কারো কাছে কোন নাহি প্রেম-ঋণ,
চাটুগান শুনি' সারা নিশিদিন
করি না ক্ষয়!

আসিবেক শীত, বিহঙ্গগীত
যাইবে থামি',
ফুলপল্লব ঝরে' যাবে সব,
রহিব আমি!

চেয়ে দেখ মোরে কোন বাহুল্য
কোথাও নাই,
স্পষ্ট সকলি, আমার মূল্য
জানে সবাই।
এ ভীরু জগতে যার কাঠিন্য
জগৎ তারি।
নখের আঁচড়ে আপন চিহ্ন
রাখিতে পারি!
কেহ জগতেরে চামর ঢুলায়,
চরণে কোমল হস্ত বুলায়,
নত মস্তকে লুটায়ে ধূলায়
প্রণাম করে।
ভুলাইতে মন কত করে ছল,
কাহারো বর্ণ, কারো পরিমল,
বিফল বাসরসজ্জা, কেবল
দু দিন তরে!
কিছুই করি না, নীরবে দাঁড়ায়ে
তুলিয়া শির
বিঁধিয়া রয়েছি অন্তর মাঝে
এ পৃথিবীর!

আমারে তোমরা চাহ না চাহিতে
    চোখের কোণে,
গরবে ফাটিয়া উঠেছ ফুটিয়া
    আপন মনে!
আছে তব মধু, থাক্ সে তোমার,
    আমার নাহি।
আছে তব রূপ,—মোর পানে কেহ
    দেখে না চাহি।
কারো আছে শাখা, কারো আছে দল,
কারো আছে ফুল, কারো আছে ফল,
আমারি হস্ত রিক্ত কেবল
    দিবসযামী!
ওহে তরু তুমি বৃহৎ প্রবীণ,
আমাদের প্রতি অতি উদাসীন,
আমি বড় নহি, আমি ছায়াহীন,
    ক্ষুদ্র আমি।
হই না ক্ষুদ্র, তবুও রুদ্র
    ভীষণ ভয়,
আমার দৈন্য সে মোর সৈন্য
    তাহারি জয়।

সাময়িক সারসংগ্রহ।

বালবিধবা।

বঙ্গদেশে যে লোকসংখ্যা নির্ণীত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই প্রদেশে সর্ব্বসুদ্ধ ৭৩,৮২,০১৮ জন বিধবা আছে।

তাহার মধ্যে ৫১,২৮,৪২০ জন হিন্দু। বয়ঃক্রম অনুসারে গণনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহাদিগের মধ্যে

৪,৬৪৭ জন	——	কেবল ৪ বৎসর বয়স্কা
২৬,৫৩৮ „	——	„ ৫ হইতে ৯ „
৬৩,২৪৬ „	——	„ ১০ হইতে ১৪ „
৯৪,৪৩১ জন		৪ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্কা

অর্থাৎ কি না, প্রায় এক লক্ষ বিধবার বয়স চার হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত!

এই তালিকাটি পাঠ করিয়া আমাদিগের মনে সমাজের প্রতি আন্তরিক ধিক্কার জন্মে। যদি এই এক লক্ষ বিধবা বালিকাদিগের এত অল্পবয়সে বিবাহ না হইয়া যথাসময়ে বিবাহ হইত, তাহা হইলে ইহারা সকলেই চিরবৈধব্যযন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইতে পারিত। চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত কন্যা রাখিলে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করা হইত না, অথচ এতগুলি অবলা দুর্ভাগিনী, বৈধব্যদশা হইতে অব্যাহতি পাইত। মনে কর ৪,৬৪৭ জন বিধবা কেবল চারি বৎসরের! ইহাদিগের মধ্যে যাহারা উচ্চজাতীয়া তাহারা একাদশীতে জল পর্য্যন্তও স্পর্শ করে না। ইহা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। বাস্তবিক হিন্দুধর্ম্ম বাল্যবিবাহের অনুমোদন করে না। তবে কেন ধর্ম্মের দোহাই দিয়া এই সকল নির্ব্বোধ অদূরদর্শী লোকেরা বাল্যবিবাহের পক্ষ সমর্থন করে! অনেকে মনে করেন যে, উন্নতিশীল লোকদিগকে ধর্ম্ম ও আচার ছাড়িতে হয়, কিন্তু ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া যে, অসংখ্য পাপ হইতে সমাজকে রক্ষা করা যায় ইহা কেহ ভাবেন না। হিন্দুসমাজ যে সকল বিষম পাপে দূষিত হইয়া আছে সমাজে থাকিয়াই সেই সকল পাপ অক্লেশে দূর করা যাইতে পারে।

রুষ ও ইংরাজ।

ব্যক্তি হউক্ বা জাতি হউক, কোন কার্য্যে ঝোঁক চাপিলে সে কার্য্যটার শেষ পর্য্যন্ত না গিয়া কেহ থামিতে পারে না। রুষ এবং ইংরাজ উভয়ে দেশজয়কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে; সেই কার্য্যটা চূড়ান্তরূপে সমাধা না করিয়া কেহই ক্ষান্ত হইতে পারিবে না। ইহাতে ইংরাজ রুষকে গালাগালি দিক্, আর রুষ ইংরাজকে বিদ্রূপ করুক, বাহিরের লোকে নিরপেক্ষ হইয়া উভয়কে সমান ভাবে দেখিবে।

এই দুই জাতির মধ্যে এমন একটি চাল দেখা যাইতেছে যাহা বুঝিতে পারিলে আমোদ এবং শিক্ষা উভয়ই হয়। আমরা ইংলণ্ডের তরফে থাকিয়া রুষের নিন্দা অনেক শুনিয়া থাকি, আবার রুষের তরফে যাহারা আছে তাহারা ইংলণ্ডের নিন্দা না শুনিয়া প্রাতঃকালে জলগ্রহণ করে না। কথাটা কিন্তু এই দাঁড়াইতেছে যে, রুষ এবং ইংরাজ উভয়ে অদৃষ্টচালিত হইয়া একই দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং শেষ সাক্ষাৎ বন্ধুভাবে হউক্ বা শত্রুভাবে হউক্ একস্থানে হইবেই হইবে। যাহাতে এই সাক্ষাৎটা না হয় ইংরাজ রাজপুরুষেরা তাহার বিশেষরূপ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইবে।

ভারত কর্ত্তৃপক্ষেরা কাবুলদেশকে মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া রুষকে দূরে রাখিতে চাহিতেছেন কিন্তু তাঁহারা অদৃষ্টচালিত হইয়া রুষের দিকেই অগ্রসর হইতেছেন। রুষও ধীরে ধীরে ভারতের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সামারখণ্ড, মার্ভ, খিবা, সারাকাস্, পাঞ্জে এবং অবশেষে পামীর ক্রমান্বয়ে রুষপদভার অনুভব করিয়াছে। আর এক লম্ফে রুষ সারাকাস্ হইতে হিরাট

এবং পামীর হইতে কাশ্মীরে আসিয়া পড়িবে। ইংলণ্ড কি করিতেছে? আমাদের রাজপুরুষেরা সিন্ধুনদের পশ্চিমস্থ যত পার্ব্বত্য পথ আছে ক্রমে ক্রমে তাহা অধিকার করিতেছেন। বোলান-পথ দিয়া এক লম্ফে তাঁহারা কান্দাহারে যাইতে প্রস্তুত আছেন। গোমল, করম, এবং খাইবার-পাস দিয়া একেবারে কাবুল অধিকার করিবেন, এবং গিল্‌গিট্‌ হস্তগত করিয়া রুষের কাশ্মীরে আসিবার পথ রোধ করিয়াছেন। সকল স্থানেই এক একটি দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং ইহাদের মধ্যস্থিত যত অসভ্য জাতি আছে সকলেই ইংলণ্ডের অধীনস্থ হইয়া আসিতেছে। সুতরাং কাবুল মধ্যস্থিত হইয়া কোনমতেই থাকিতে পারিবে না। রুষ হিরাটে আসিলেই ইংরাজকে কান্দাহার অধিকার করিতে হইবে, এবং রুষ পামিরের দিক দিয়া আর একপদ অগ্রসর হইলেই ইংরাজকে চিত্রলে গিয়া তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

যে রূপে হউক, রুষ এবং ভারতকে প্রতিবাসী হইতেই হইবে। ইহাদিগের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলেই বিপদ, কিন্তু কেবল প্রতিবাসী হইয়া থাকিলে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। বরং দুই সভ্যজাতি কাছাকাছি থাকাতে অনেকের অনেক বিষয়ে লাভ হইবার সম্ভাবনা। তবে পাঠকেরা জানেন, ইংলণ্ড এবং রুষ একদিকে যেমন ভাব করিবার চেষ্টা করিতেছে অন্যদিকে আবার পরস্পরের গলা কাটাকাটি করিবার জন্যও বিশেষ আয়োজন করিতেছে। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে কেবল যে, এসিয়াকে ভুগিতে হইবে তাহা নহে, য়ুরোপ এই যুদ্ধের মহাক্ষেত্র হইবে। এই য়ুরোপে আজকাল রুষেরা নানা চাল চালিতেছে। পাঠকেরা জানেন যে, জার্ম্মাণি ফ্রান্সের শত্রু এবং ফ্রান্স জার্ম্মাণির শত্রু, এবং ইহাও জানেন যে,

জার্ম্মাণি রুষের শত্রু এবং রুষ জার্ম্মাণির শত্রু। জার্ম্মাণিকে এই দুই দেশের সহিত যুদ্ধ কখন-না-কখন করিতেই হইবে। কিন্তু জার্ম্মাণরা যুদ্ধ নিরাকরণ করিবার জন্য অষ্ট্রিয়া ও ইতালির সহিত ত্রিসন্ধিতে আবদ্ধ আছে। তাহারই জন্য ফ্রান্স এত দিন য়ুরোপের শান্তিভঙ্গ করিতে পারে নাই। কিন্তু সম্প্রতি ফ্রান্স এবং রুষের মধ্যে একটা সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এই দুই দেশের মধ্যে নানাপ্রকার জাতিগত, ধর্ম্মগত, নীতিগত প্রভেদ আছে। রুষের রাজা স্বেচ্ছাচারী, কোনপ্রকার শাসনপ্রণালীতে আবদ্ধ নহে; আর ফ্রান্স সাধারণতন্ত্রী, রাজগণের পরম শত্রু। একজন প্রজাপীড়ক; অন্যটি রাজবংশপীড়ক। এই দুই দেশের মধ্যে বন্ধুতা আছে শুনিলে হাসি পায়। কিন্তু এক বিষয়ে উভয়ের মিল আছে। উভয়েই জার্ম্মাণি এবং ইংলণ্ডের শত্রু।

মিসরদেশে যে সুয়েজ-খাল আছে, ফ্রান্সের অধিপতি তৃতীয় নেপোলিয়ান অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া সেই খাল নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার স্বত্ব অনেকটা ফ্রান্সের হাতে ছিল। কিন্তু ইংলণ্ড মধ্য হইতে চারি কোটি টাকা দিয়া মিসরদেশের হাত হইতে এই খালের অনেকগুলি সেয়ার ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। এই সুয়েজ-খাল হস্তগত হওয়াতে ইংরাজ মিসররাজ্যটাও করতলন্যস্ত করিয়াছে এবং ফ্রান্স বেচারীকে একপ্রকার মিসর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। এখন মিসরে ইংলণ্ডের আধিপত্য কিরূপে বিনষ্ট হয় ফ্রান্সের তাহাই চেষ্টা।

ইংলণ্ড এবং ভারতের মধ্যে যে সকল পথ আছে ইংরাজ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সেইসকল পথ রক্ষা করিতেছে। ভূমধ্যসাগরের প্রবেশপথে জিব্রল্টার; সেই সাগরবক্ষে মাল্টা ও কাণ্ডিয়া; সুয়েজ;

লোহিতসাগরের প্রবেশপথে এডেন্; এই সকল বিবিধ স্থান অতিক্রম করিয়া তবে ইংলণ্ডের কোন শত্রু জাহাজ লইয়া ভারতে আসিতে সক্ষম হইবে। এই সকল স্থান দখল করিয়া ইংলণ্ড সমুদ্রের উপর একরূপ একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। রুষও অনেক দিন হইতে সমুদ্রতীরস্থ এইপ্রকার দুই একটা স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এখন ফ্রান্সের সহিত বন্ধুতা হওয়াতে রুষের অনেক দিনের খেদ মিটিয়াছে। প্রথমতঃ রুষ এবং ফ্রান্স ভারতকে মধ্যস্থলে ফেলিতে চেষ্টা করিতেছে। রুষ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমায় প্রায় উপস্থিত, ফরাসীরা শ্যামদেশের অনেকটা সম্প্রতি হস্তগত করিয়াছে। সুতরাং যুদ্ধ উপস্থিত হইলে রুষ এবং ফ্রান্স দুই দিক হইতে ভারতকে বেশ উৎপীড়ন করিতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধ হইলে রুষ সমুদ্রবক্ষে ইংরাজের বাণিজ্য নষ্ট করিতে বিশেষ চেষ্টা করিবে। কিন্তু সমুদ্রে যুদ্ধ হইলে মধ্যে মধ্যে কয়লা লইবার আড্ডা হওয়া আবশ্যক। ফরাসী এসম্বন্ধে রুষকে বিশেষ সাহায্য করিতেছে। সম্প্রতি তাহারা শ্যামদেশের অন্তর্গত একটি বন্দর রুষকে দিতে চাহিয়াছে এবং ফ্রান্সের অন্তর্গত ভূমধ্যসাগরতীরস্থ আর একটি বন্দর রুষ বিনা খরচায় প্রাপ্ত হইয়াছে। রুষের এই চালটি ইংলণ্ডের অতিশয় উদ্বিগ্নের কারণ হইয়াছে, কারণ, যুদ্ধ হইলেই রুষ এবং ফরাসী উভয়ে জাহাজ লইয়া সুয়েজ-খাল আটকাইতে পারে এবং এসিয়ায় শ্যামদেশের বন্দর হইতে রুষ জাহাজ বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করিয়া ইংলণ্ডের বাণিজ্য নষ্ট করিবে। এখন ইহার পর ইংলণ্ড কি চাল চালেন দেখা যাউক্।

যুদ্ধ বাধিলে কি কি ঘটনা ঘটিতে পারে অনুমান করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ কাবুলের দিক হইতে এক প্রকাণ্ড রুষ সৈন্য

ভারতের দ্বারে আঘাত করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ শ্যাম অতিক্রম করিয়া ফরাসীরা আর একদল সৈন্য লইয়া ব্রহ্মদেশে উপস্থিত হইতে পারে। তৃতীয়তঃ ফ্রান্স রুষ উভয়ে সুয়েজ-খাল দখল করিয়া ইংলণ্ডের ভারতে আসিবার পথ রুদ্ধ করিয়া দিতে পারে। চতুর্থতঃ অসংখ্য রুষ রণতরী শ্যামদেশ হইতে নির্গত হইয়া ইংরাজদিগের জাহাজসকল মারিয়া লইতে পারে। এমন কি, বোধ হয় কোন দিন শুনিতে পাইব যে, রুষ সত্য সত্য গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এ সকল ঘটনা যে অবশ্যম্ভাবী তাহা বলা যায় না। তবে রুষের চাল দেখিয়া এ সকল ফল দূরদৃষ্টিতে দেখা যায়। সম্প্রতি ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে আর এক চাল আরম্ভ হইয়াছে। ডুরাণ্ড সাহেব কাবুলে গিয়া কি করিয়াছেন তাহা এখনও প্রকাশ হয় নাই। বোধ হয় শীঘ্রই হইবে।

গর্জ্জন ও বর্ষণ।

মেঘ ডাকিলে আমরা সাধারণতঃ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া থাকি, বর্ষণের সহিত ইহার যে, একটী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা হঠাৎ আমাদের চক্ষে পড়ে না। বৃষ্টিবর্ষণের সময় মেঘ গর্জ্জন হইলে, গর্জ্জনের অব্যবহিত পরে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি পড়ে ইহা বোধ হয় অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু ইহার কারণ কি? গর্জ্জন দ্বারা বর্ষণ হয়, না বর্ষণ গর্জ্জন করায়?

উপরোক্ত প্রশ্নটী লইয়া গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বৈজ্ঞানিক মহলে মহা বাক্‌বিতণ্ডা চলিয়াছিল। এই আন্দোলনের সময় মার্কিন বৈজ্ঞানিক, জেনারাল ডাইরেণফর্থ্‌ শব্দ দ্বারা বৃষ্টি করিতে

কৃতকার্য্য হওয়ায় অধিকাংশ লোকেই, গর্জ্জনকে বর্ষণের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া ঠাহরাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে—জলীয় বাষ্প-পূর্ণ আকাশে কোন কারণে একটী বৃহৎ শব্দ হইলে, নিকটবর্ত্তী বায়ুস্তরসকল কাঁপিয়া একপ্রকার শব্দ-তরঙ্গ উৎপন্ন করে, এই সকল তরঙ্গের ক্রমিক সঙ্কোচন ও প্রসারণে আকাশে ভাসমান জলকণাসকল একত্রীভূত ও পরক্ষণে জলবিন্দুরূপে পরিণত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে পড়িতে থাকে।

ডাইনামাইট, বারুদ, এবং অক্সিজেন হাইড্রোজেন দ্বারা কৃত্রিম শব্দ করিয়া ডাইরেণফর্থের বর্ষণে কৃতকার্য্য হওয়া ব্যাপারটা, উল্লিখিত সিদ্ধান্তটীকে কিছুদিন নির্ভুল বলিয়া চালাইয়াছিল। কিন্তু যখন অধ্যাপক নিউকুম্বপ্রমুখ পণ্ডিতগণ ডাইরেণফর্থের সিদ্ধান্তের ভ্রম বাহির করিতে লাগিলেন—তখন আবার বর্ষণ-গর্জ্জন ব্যাপারটার উপর সকলের দৃষ্টি পড়িল। কয়েকজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক দল বাঁধিয়া বলিলেন,—"বর্ষণই গর্জ্জনের কারণ, গর্জ্জন বর্ষণের কারণ হইতে পারে না; আর যদি পুরাতন সিদ্ধান্তটী সত্য ধরিয়া গর্জ্জন-কেই বর্ষণের কারণ বলা যায়, তাহা হইলে মেঘ ডাকিবার অব্যবহিত পরে বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি না হইয়া, প্রায় এক মিনিট পরে বৃদ্ধি দেখা যাইত।" মেঘের সাধারণ উচ্চতা ধরিয়া এবং শব্দের গতি ও ভূমধ্যাকর্ষণজনিত বারিবিন্দুর গতি হিসাব করিয়া ইঁহারা পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির সত্যতা বেশ প্রমাণ করিয়াছেন*।

* ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বরের Scientific American এবং North American Review পত্রিকাগুলি দেখুন।

বর্ষণই যে গর্জ্জনের কারণ তাহা প্রমাণ করিতে তাড়িত-শক্তিপূর্ণ পদার্থের যে কয়েকটা সাধারণ ধর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে জানা আবশ্যক ;—তাড়িত শক্তিপূর্ণ একখণ্ড মেঘ তাহার নিকটস্থ বিরুদ্ধশক্তিপূর্ণ মেঘখণ্ডে আপন তাড়িত প্রেরণ করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকে—এইটী পরস্পর বিরুদ্ধতাড়িত-শক্তিপূর্ণ পদার্থদ্বয়ের সাধারণ ধর্ম্ম ; যদি উভয় পদার্থের মধ্যে অল্প ব্যবধান থাকে, অথবা যদি তাড়িতশক্তি উপযুক্তরূপ প্রবল হয়, তাহা হইলে বিরুদ্ধভাবাপন্ন তাড়িতদ্বয় আলোক ও তাপ উৎপাদন করিয়া মিলিত হইয়া উভয় শক্তির লোপ করে ; এই আলোককেই আমরা বিদ্যুৎ বলি এবং তাড়িতদ্বয়ের সম্মিলনকালীন বায়ুরাশির পরস্পর সংঘর্ষণ ও আলোড়নজনিত শব্দকেই আমরা মেঘগর্জ্জন বলি।

পূর্ব্বোক্ত বৈদ্যুতিক সত্যগুলি অবলম্বন করিয়া এই দলের বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, শীতল বায়ুপ্রবাহের সম্মিলনাদি বৃষ্টিবর্ষণের সাধারণ কারণের ন্যূনাধিক্যের উপরই বর্ষণের পরিমাণ নির্ভর করে, ইহাতে গর্জ্জনের কোন প্রভাবই নাই ; যখন কোন এক তাড়িতশক্তিসম্পন্ন মেঘখণ্ড হইতে অবিচ্ছেদভাবে বৃষ্টিধারা পড়িতে থাকে তখন এই মেঘ বহুদূরবর্ত্তী থাকা সত্বেও ইহার তাড়িত বৃষ্টিধারার সহিত আসিয়া, অল্পদূরবর্ত্তী অপর মেঘখণ্ডের তাড়িতের সহিত মহাশব্দ ও আলোক সহকারে মিলিত হইয়া থাকে, আর যদি বারিধারার পথের অনতিদূরে কোন মেঘ না থাকে, তাহা হইলে ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, ইহার তাড়িত বজ্ররূপে মহাশব্দে পৃথিবীর তাড়িতের সহিত মিলিত হইয়া যায় *। বৃষ্টি-

* প্রায়ই বজ্রপাতের পরক্ষণে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি পড়িতে দেখা যায়।

ধারা ভূপৃষ্ঠের অতি নিকটবর্ত্তী হইলে এই ঘটনা হয় বলিয়া এবং শব্দের গতি, বৃষ্টিপতনের গতি অপেক্ষা অধিক বলিয়া, গর্জ্জনের অব্যবহিত পরেই বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়।

যাহা হউক উপস্থিত প্রশ্নটীর আজও উত্তমরূপ মীমাংসা হয় নাই, তবে বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ে বিষয়টী লইয়া যে প্রকার তর্ক বিতর্ক চলিতেছে, তাহাতে আশা করা যায় যে, অভ্রান্ত সিদ্ধান্তটী শীঘ্রই স্থিরীকৃত হইবে।

স্বরলিপি।

মিশ্র মল্লার—তাল একতালা।

যদি আসে তবে কেন যেতে চায়?
দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায়?
চেয়ে থাকে ফুল হৃদয় আকুল,
বায়ু বলে এসে ভেসে যাই।
ধরে রাখ, ধরে রাখ,
সুখ পাখী ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায়॥
পথিকের বেশে সুখ নিশি এসে
বলে হেসে হেসে, মিশে যাই!
জেগে থাক, জেগে থাক,
বরষের সাধ নিমেষে মিলায়।

পা

॥
সা। ঋা -া -ঋা॥ মপমা -া -গা। ঋা -া -া।
য। দি — —॥ আ — —। সে — —।

গ
।-া রা ঋা। পা পা -ধপা। মপমা -া গা। ঋা -া গা।
।— ত বে। কে ন —। যে — তে। চা — —।

পা
।-ঋা -পা মা। মা -া -া। মা -া -গমগা। ঋা -া -া।
।— য় য। দি — —। আ — —। সে — —।

।-া -গঋা সা। ঋা -া -া। মা -া -া। পা -া -া।
।— — দে। খা — —। দি — —। য়ে — —।

।-া র্সা র্সা। র্সাঃ -নঃ র্ঋা। র্সর্ঋর্সা -া ঞা। ধাঃ -ঞঃ -পধা।
।— ত বে। কে — ন। গো — লু। কা — —।

।-ঞা -া ধা। পা -া -ধপা॥ -া -া -সা। ঋা -া -া।
।— য় য। দি — —॥ — — চে। য়ে — —।

।মা -া মা। পা -া -া। -া -া -ধপা। মা পা -া।
।থা — কে। ফু — —। — — ল্। হৃ দ —।

।নধা -না না। র্সা -া -া। -া -া -র্ঋর্সা। না র্সা -া।
।য় — আ। কু — —। — — ল্। বা — যু।

।র্ঋর্সা -র্ঋা র্ঋা। র্জ্ঞা -া -র্ঋর্সা। র্ঋা -া -া। -া -া -া।
।ব — লে। এ — —। সে — —। — — —।

।র্সা র্ঋাঃ র্সঃ। না -া -ধনা। -র্সা -া -া। -া -া র্ঋা।
।ভে সে —। যা — —। — — —। — ই ধ।

। {র্সা ঞা -ধা। পা -া পা। র্মা র্গা -র্রা। (র্সা -া র্রা)। }
। {রে রা —। থ — থ। রে রা —। (থ — থ)। }

। র্সা -া -া। র্সা র্সা -র্র্সা। ঞা র্রা র্সা। ঞা ধা পা।
। থ — —। সু থ —। পা খী ফাঁ। কি দি য়ে।

। মপমা -া গা। রা -া -গা। -রা -গা মা। মা -া -া॥
। উ — ড়ে। যা — —। — য় য। দি — —॥

। -া -া সা। রা -া -া। রা -া -রা। রা -া -া।
। — — প। থি — —। কে — য়। বে — —।

। রা -া পা। মা -া -া। মা -া মা। গা -া -মগা।
। শে — স্। থ — —। নি — শি। এ — —।

। রা -গা সা। রা -া -া। মা -া মা। পা -া -া।
। সে — ব। লে — —। হে — সে। হে — —।

। র্সা -ঞর্সা -ঞা। ধা -া ঞধা। পধপা -া -মা। পা -া -া।
। সে — —। নি — —। শে — —। যা — —।

। -া -া না। না -া -া। {নাঃ -ধঃ -না। র্সা -া -া।
। — ই জে। গে — —। {থা — —। ক — —।

। র্সা র্সা পর্সা। র্সা -া -া। র্সনা -র্রা -র্সা। র্রা -া -া।
। স খি জে। গে — —। থা — —। ক — —।

(। -া -র্জ্ঞর্রা র্সা। র্সর্রা -না -া)।} -া -া -া। র্সা -র্রা র্সা।
(। — — জে। গে — —)।} — — —। ব — র।

। ঞর্সঞা -ন ধা। পা -ন -ন। ধা -ন -পধপা। মা ধা পা।
। যে — র। সা — —। ধ — — । নি মে যে।

। ঋপমা -ন -গা। গঋা -ন -গা। -ঋা -পা মা। গমা -ন -ন ॥
। মি — —। লা — —। — য় য। দি — — ॥

ব্যাখ্যা।

(১) ঞ=কোমল নি। ঋ=কোমল গা।

(২) কোন কলির শেষে পার্শ্ববর্ত্তী যুগল ছেদ, গোড়ায় ফিরিয়া যাইবার চিহ্ন। গানের আরম্ভে যেখানে যুগল ছেদ দেখিবে, ফিরিয়া গিয়া সেইখান হইতে ধরিবে। এবং যেখানে শিরোদেশে যুগল ছেদ দেখিবে সেইখানে থামিবে। থামিয়া আবার অন্য কলি ধরিবে।

(৩) যুগল ছেদ যেরূপ আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইবার বিশেষ চিহ্ন, গুম্ফ-বন্ধনী সেইরূপ পুনরাবৃত্তির সাধারণ চিহ্ন। কোন কলির অন্তর্ব্বর্ত্তী অংশে যখন পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয় তখনই এই বন্ধনীর প্রয়োগ হয়। পুনরাবৃত্তিকালে কোন অংশ উল্লঙ্ঘন করিতে হইলে বক্র-বন্ধনীর ব্যবহার হয়।

বুড়া বয়সের কথা।

বুড়া বয়সে কপালগুণে যে ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিল তোমরা তাহাকে অল্পে ছাড় না। "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" শ্লোকার্দ্ধ অবলম্বন করিয়া কেহ নিন্দা কর, কেহ বিদ্রূপ কর, কেহ বা রাগও

কর, আরও যে কিছু না কর তাও বলিতে পারি না! তা' তোমরা রাগ করিতে পার, যাহা যুবারই প্রাপ্য তাহা বুড়া হইয়া আমরা লইয়াছি, সুতরাং তুমি যুবা, তুমি রাগ করিতে পার! কিন্তু শুধু রাগ করিলেও বাঁচিতাম।

আমরা বেশ সুখে আছি, কিন্তু আমাদের দুঃখ ভাবিয়া, তোমরা পাঁচজন পাড়াপড়শী তোমাদের চোখে যে, ঘুম নাই। ওই ত জ্বালা! আর তোমরা যে বিদ্রূপের চাপা হাসি হাসিয়া কথায় কথায় আমাদিগকে "পিটি" করিতে এস সেটাও কিছু অসহ্য। তাই আজ এ বয়সের গোটাকত কথা তোমাদিগকে শুনাইব। দেখিও বুড়ার সুখ শুনিয়া যেন ভাবান্তর না হয়।

প্রথম কথা তোমরা বল, বুড়া বয়সে নবীনার পাণিগ্রহণ করিলে, বিবাহের যে প্রধান উদ্দেশ্য "একীকরণ" তাহা সাধিত হয় না। সে কেবল জলে "তৈলীকরণ" হয়। সুতরাং অমিলেই জীবন কাটিয়া যায়, দুঃখেরও অবধি থাকে না। আমরা কিন্তু এ কথা মানি না। তোমাদের এ কথার উত্তরে ভক্ত রামপ্রসাদের মত এইমাত্র বলিতে চাই :—

একীকরণে কিবা ফল
জলেতে মিশায় জল
চিনি হওয়া ভাল নয় ভাই, চিনি খেতে ভালবাসি।

এখন বুঝিয়া দেখ তোমাদের "একীকরণ" অপেক্ষা আমাদের এ "তৈলীকরণ" ভাল কি না?

দ্বিতীয় কথা তোমরা বলিতে চাও প্রকৃত ভালবাসা আমাদের অজ্ঞাত; কেন না, তোমাদের বিশ্বাস ভালবাসাটা তোমরা যুবক যুবতীর দল একচেটীয়া করিয়া বসিয়া আছ! আমার কথা শুনিয়া তোমরা হাসিবে তা' হাস, কিন্তু প্রাকৃতপক্ষে তোমরাই

ভালবাসিতে জান না। হেমচন্দ্র প্রাণ অপেক্ষাও মৃণালিনীকে ভালবাসিতেন এই তাঁর বিশ্বাস, কিন্তু সেই মৃণালিনীর নামে একটু কলঙ্ক শুনিয়া সত্য কি মিথ্যা বিচার না করিয়াই অমনি হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিতে, এমন কি, তার প্রাণনাশ করিতেও কৃতসংকল্প হইলেন। আবার দেখ, তোমাদের আদর্শ প্রেমিকা সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্রনাথকে কুন্দনন্দিনীতে অনুরক্ত দেখিয়া, তাহাকে ত্যাগ করিয়া একবারে কাশীতে উপস্থিত। কিন্তু এমন কেহ দেখিয়াছ কি যে, কোন যুবকের প্রতি নবীনার অনুরাগলক্ষণ প্রবল দেখিয়া আমাদের মধ্যে কেহ কাশীবাসী হইয়াছে? এরূপ স্থলে আমাদের পক্ষে—

"কাজ কি আমার কাশী
ওই পদ-কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি।"

কিন্তু আমাদের এ ভালবাসা কেহ বড় একটা "এপ্রিসিয়েট" করিতে পারিল না। বঙ্কিম বাবু পর্য্যন্তও এইরূপ চঞ্চলমতি যুবক যুবতীর ভালবাসা দেখাইতেই ব্যস্ত, কিন্তু বেচারা বুড়াদের এরূপ নিঃস্বার্থ ভালবাসা তাঁহারও নভেলে স্থান পাইল না। আমরা যে কেবল ভালবাসি, তাই নয়, প্রতিদানের আশাও বড় একটা রাখি না। কিন্তু তোমাদের ভালবাসা অনেকটা প্রতিদানের আশায়।

"তুমি ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসি নে" এ কথা আমরাই বলিতে পারি। এই মহান ভাবে তোমাদের অধিকার নাই।

ভালবাসার প্রতিদান না পাইলে তোমরা অধীর হইয়া উঠ, তখন তোমরা অনেকে মনের দুঃখে গাও—

"ভালবাসা ভুলে যাব, মনেরে বুঝাইব
পৃথিবীতে আর যেন কেউ কারে ভালবাসে না।"

কিন্তু এরূপ স্থলে আমরা কি করি, আমরা বলি—

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বসিয়ো!
* * * * *
তুমি চিরদিন মধুভবনে
চির- বিকশিত বন-ভবনে
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া
তুমি নিজ সুখস্রোতে ভাসিয়ো!

শুনিতে পাই রচয়িতা, গানটী কোন যুবতীর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, কিন্তু আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি—

যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া
তুমি নিজ সুখস্রোতে ভাসিয়ো।

ইহা কোন যুবক যুবতী প্রাণ ধরিয়া বলিতে পারে না। এ সব কথা আমাদের মত বুড়ারাই বলিতে পারে। সঙ্গীত-রচয়িতা আমাদের মত বুড়া কি না জানি না, কিন্তু গানটী কোন যুবকের অন্তর হইতে বাহির হইয়াছে এ বিশ্বাস সহজে হয় না—কেন না, এতবড় উদার ভাবের কথা কেবল আমাদেরই মুখে শোভা পায়। আর এক কথা, যেমন-তেমন প্রতিদানেই তোমরা সুখী নও, প্রতিদানটা আঠার আনা হওয়া চাই, নহিলে তোমাদের খুঁৎ খুঁতুনী যায় না। তোমরা যুবক যুবতী কেহই সহজে পরস্পরের নিকট খাট হইতে চাহ না। উভয়েই আশা কর পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিবেই; আবার যে-সে ভালবাসাতেও তোমাদের মন উঠে না। তোমাদের নভেলী ভালবাসা চাই। কিন্তু তেমনটি ত সংসারে ঠিক মিলে না। যেমন ভালবাসাই হউক সংসার করিতে গেলে ভালবাসার পাণ হইতে এক আধ দিন চূণ খসিবেই খসিবে। এ দিকে কিন্তু এই সামান্যতেই তোমাদের সুখ নষ্ট করে, আর আমাদের?—আমরা জানি আমরা আমাদের গৃহিণীর উপযুক্ত

নহি। আর আরও জানি গৃহিণীর চক্ষে আমাদের সম্বন্ধ কেবল দানের,—অলঙ্কারের কি ভালবাসার ঠিক জানি না ;—কিন্তু এটা জানি আমরা প্রতিদানের আশা করিতে পারি না, তাই বড় একটা করিও না। মনের এই অবস্থায় গৃহিণী যদি একদিন যে কারণেই হোক হাসিয়া দুটা কথা ক'ন কিম্বা বাহিরে যাইবার সময় প্রফুল্ল-মুখে একটা পাণ হাতে দেন তবে যেন হাতে হাতে স্বর্গ পাই। তখন ভালবাসার এই অপূর্ব্ব প্রতিদান পাইয়া শরীর পুলকিত হইয়া উঠে, আনন্দের অবধি থাকে না। এখন বুঝিয়া দেখ সুখী কে ? তোমরা না আমরা ?

সুখদুঃখের কথা ছাড়িয়া তোমরা আর একদিক হইতে আমাদিগকে একটু বেশী গালিগালাজ কর। আমরা বুড়া বয়সে কালাপেড়ে কাপড় পরি, ভাল সাজসজ্জা করি, পড়া দাঁত বাঁধাই, পাকাচুলে কলপ দিই—এই সব লইয়া তোমরা তামাসার বড় বাড়াবাড়ি কর। এই সে দিন একটী যুবক আমাদের চুলের কলপ লইয়া আমাদিগকে কি না বলিলেন ! তিনি প্রমাণ করিতে চান আমরা প্রবঞ্চক, নীচ ইত্যাদি। কেন বাপু, আমাদের অপরাধটা কি ? আমরা বুড়া বয়সে যুবার সাজ সাজি, তা' কাচ কাচি-বার জন্য নহে—গৃহিণীর মনোরঞ্জনের জন্য। আমরা যাহা করি, তাহা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবেই করি ; যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে সুখী করাই আমাদের উদ্দেশ্য। গ্যালানট্রির দল হইতেও শুনিতে পাই, যুবতী ভার্য্যা যে অঙ্গরাগ করেন, যে বেশভূষা করেন, তা' কেবল স্বামীর আনন্দবর্দ্ধনের জন্য ; তবে আমাদের বেলা সেটি না হয় কেন ? চুলের কলপে যদি আমাদেরই দোষ হয়, তবে অলক্কার-ঝলকে যুবতীর দোষ না স্পর্শিবে কেন ? তাহাতে ত কেহ কিছু বল না ? সাধে কি দুঃখ করিয়া বলি—

কে না যায় যমুনায় কে না যায় মথুরায়
মাথে লয়ে দধির পসরা।
তোমার ও চন্দ্রবদন কে না করে নিরীক্ষণ
সবে ভাল কলঙ্কী আমরা।

তবে একটা কথা তোমাদের বলিবার আছে। নবীনার পাণি-গ্রহণ করিয়া আমরা না হয় সুখী হইলাম, কিন্তু নবীনার কি সুখ? বুড়া স্বামী হইলেই যে স্ত্রী সুখী হইতে পারিবে না এমন কোন ধরাবাঁধা আইন নাই। সতী, উমা, ইহারাও ত বুড়া স্বামীর হাতে পড়িয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের মত সুখী স্ত্রী কয়টা দেখাইতে পার? তাঁহাদেরও মাঝে মাঝে কলহ কাঁদাকাটি না হইত এমন নয়, কিন্তু সেটা দাম্পত্য কলহ। তেমন কলহ আমাদেরও হয়, বরং কিছু বাড়াবাড়িও হয়—কিন্তু তাতে কত সুখ!

"অভিমান ছলছল মুছাতে নয়ন জল
লাগে কত সুখ,
তোমরা ত ভাই বুঝ্‌লে না কো
রয়ে গেল দুখ।"

তোমরা অবশ্য জান বৈচিত্র্যই জগতে আনন্দের মূল। যে-খানে বৈচিত্র্য নাই সেখানে উপভোগে দিনে দিনে অবসাদ বা বিরক্তি অবশ্যম্ভাবী। তোমরা কি কখন প্রণয়িনীর রূপের বৈচিত্র্য দেখিতে পাও? কিন্তু আমরা দিবানিশি বুড়া শিবের মত এক গৃহিণীতেই দশমহাবিদ্যা দেখিতে পাই। সে যোড়শী মূর্ত্তি কখন কালী, কখন তারা, কদাচিৎ ভুবনেশ্বরী, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই ধূমাবতী।

আজও দেখিতে পাই কুমারীরা বিবাহের জন্য সেই বুড়া শিবেরই পূজা করে; কিন্তু বিবাহের জন্য তোমাদের মত কার্ত্তি-

কের পূজা কেহ করে না! এখন ভাবিয়া দেখ সুখী কে? তোমরা না আমরা? আজিকার মত আমার কথাটী এইখানেই ফুরাইল।—

বুড়া বয়সের কথা অমৃত সমান
মন দিয়া যুবা ভাই কর অবধান।

ইতি। কস্যচিৎ বৃদ্ধস্য।

পিয়ের লোটি ও ইস্তাম্বুল।

(৩)

ইস্তাম্বুলের অভ্যন্তরে ইজেদ্দিন আলি এফেন্দির বাটীতে নিমন্ত্রণ সভা হচ্ছিল; সুগন্ধী দ্রব্যের ধূম্র, তামাকুর ধূম্র, ছোট ছোট পিতলের চাকা-বসানো তাম্বুরীণ, * এবং মনুষ্যকণ্ঠে যেন স্বপ্নস্বরে প্রাচ্যদেশের বিচিত্র সুর গাওয়া।

এই নিমন্ত্রণসভাগুলি প্রথম প্রথম আমার অদ্ভুত বর্ব্বরতা বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে অভ্যাস হয়ে গিয়ে শেষে আমার ওখানেও এইরূপ সম্মিলন হ'ত, যাতে তবূলার শব্দে লোকে সুগন্ধ ও ধূম্রে বিহ্বল হয়ে পড়ত।

ইজেদ্দিন আলির নিমন্ত্রণে লোকে সন্ধ্যাবেলা এসে একেবারে সেই সকালে বাড়ি ফেরে। বরফপড়া রাত্রিতে ইস্তাম্বুলের রাস্তা বড় দীর্ঘ মনে হয় এবং ইজেদ্দিন খুব উদারভাবে অতিথি-সৎকার করে।

ইজেদ্দিন আলির বাড়ির বাইরেটা প্রাচীন ও জীর্ণ, কিন্তু তার

---

* গোল চেপ্টা ফাঁপা কতকটা ড্রামের মত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

মলিন দেয়ালের ভিতরে প্রাচ্য বিলাসিতার রহস্যময় ঐশ্বর্য্য আবদ্ধ। যা কিছু "এস্কি", যা কিছু সেই সুখস্মৃত অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা কিছুতে সেকালের ছাপ মারা, ইজেদ্দিন আলি কেবলমাত্র সেই সকলের চর্চ্চা করে।

লৌহমণ্ডিত ভারি দরজায় আঘাত করলে দুটি ছোট সির্কাশিয়েন ক্রীতদাসী নিঃশব্দে এসে খুলে দেয়। তার পরে লণ্ঠন নিভাও, যুতা খোল,—এই দুই অতি গৃহস্থ সাধারণ কাজ তুরকের আচার দ্বারা আদিষ্ট। প্রাচ্যদেশে বাড়ির ভিতর কখনো বাইরের কাদায় কলঙ্কিত হয় না; সেটা দরজায় রেখে আসা হয়, এবং যে বহুমূল্য গালিচা পৌত্র পিতামহের কাছ থেকে পেয়েছে, তাহা কেবল চটি যুতা বা খালি পায়ে মাড়ানো হয়।

এই দুটি দাসীর বয়স আট বৎসর; পরে তারা বিক্রীত হবে সেটা তারা জানে। তাদের বিকশিত মুখমণ্ডল সুশ্রী ও মনোহর; তাদের ছেলেমানুষী চুল মাথার উপরে খুব উঁচু করে' বাঁধা, তাতে ফুল দেওয়া। তারা ভক্তিসহকারে অতিথিদের হাত নিয়ে আস্তে আস্তে কপাল দিয়ে স্পর্শ করে। ... ...

জমকালো পারস্য গালিচা পাতা, পুরাতন অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়; হারেমলিক্* আস্তে আস্তে ঈষৎ উদ্‌ঘাটিত হয়, এবং একটি ঝিনুক-বসানো দরজার ফাঁক দিয়ে রমণীচক্ষু আগন্তুককে নিরীক্ষণ করে।

একটি বড় কামরায়, যেখানে গালিচা এত মোটা যে, মনে হয় যেন কাশ্মীরী মেষপৃষ্ঠে পা ফেলচি,—পাঁচ ছয়টি যুবক, সুখী নিশ্চিন্ত ভাবে, বা শান্ত দিবাস্বপ্নের অবস্থায়, আসন হয়ে বসে আছে। একটি খোদিত তাম্রনির্ম্মিত পাত্রস্থিত কয়লার আগুন

* তুরক অন্তঃপুর।

এই ঘরে একপ্রকার গরম এবং ঈষৎ ঘন বাতাসের সৃজন করেছে, যাতে নিদ্রার আকর্ষণ হয়। খোদিত ওক্‌কাষ্ঠের ছাদ থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ মোমবাতী ঝুলানো; সেগুলি পুষ্পাকার রঙীন কাঁচখণ্ডে আবদ্ধ, তার ভিতর থেকে কেবলমাত্র এক গোলাপী, কোমল, অনত্যুজ্জ্বল আলো নির্গত হচ্ছে।

এই তুরস্ক সান্ধ্য সম্মিলনে স্ত্রীলোক যেরূপ অজ্ঞাত, চৌকীও সেইরূপ। কেবলমাত্র অতি নীচু দিবান* আসিয়ার বহুমূল্য রেশম-খণ্ডে আবৃত। ফুলকাটা রেশমী কাপড়, সাটিন ও জরির তাকিয়া; রূপার থালার উপর যুথিকাষ্ঠের লম্বা লম্বা সিবুক† রক্ষিত; ছোট ছোট অষ্টকোণ পিঁড়ার উপর নারগিলে ‡ স্থাপিত, সেগুলির মুখে এক একটি স্বর্ণখচিত অম্বরের কন্ধে।

ইজেদ্দিন আলির ওখানে সকলেই যেতে পারে না, বেছে বেছে লোক নিমন্ত্রণ করা হয়;—এরা সেই গোম্‌সা বোকা পাশার ছেলে নয়, যারা পারিসের ময়দানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়; এরা সকলেই "প্রাচীন তুরস্কের" সন্তান, সোনালীয়ালিতে § মানুষ হয়েছে, যেখানে পাশ্চাত্য দেশের কয়লার ধোঁয়ায় দূষিত সাম্যের বাতাস প্রবেশ লাভ করতে পারে নি। অভ্যাগতের দলের মধ্যে কেবলমাত্র সমজদার চেহারা এবং দীপ্তি ও যৌবনপূর্ণ দৃষ্টি নজরে পড়ে। এই যে লোকগুলি দিনের বেলা য়ুরোপীয় পোষাকে বেড়াচ্ছিল, তারা সন্ধ্যাবেলা, আপনার দুর্ভেদ্য গৃহের অভ্যন্তরে আবার সেই রেশমী কামিজ এবং লোমের আস্তর-দেওয়া লম্বা

---

* একপ্রকার নরম গদি দেওয়া বসিবার কৌচের মত।
† খুব লম্বা ডাণ্ডিওয়ালা তুরস্ক পাইপ।
‡ কতকটা গুড়গুড়ির মত।
§ ভাবে বোধ হয় বাড়িকে বলে।

শালের চোগা পরিধান করেছে। ছাইরঙের ওভারকোট্‌টা কেবল একটা ক্ষণিক শ্রীহীন আবরণ ছিল, যা ওদের আসীয়িক গঠনে ভাল মানাচ্ছিল না।

সুগন্ধ ধুম্র ঘরের উত্তপ্ত বাতাসে নানাপ্রকার পরিবর্তনশীল জটিল ঘুরপাক অঙ্কিত করছে; আস্তে আস্তে কথাবার্তা চলছে,—বিষয়টা হচ্ছে যুদ্ধ, ইয়াটাক * ও "মস্কাউ"দের † বিদায়গ্রহণ, এবং ইস্‌লাম ও খলিফের অদৃষ্টে আল্লা কি মৃত্যুলিখন লিখেছেন তৎসম্বন্ধীয়। আরব্য কাফির অতি ক্ষুদ্র পেয়ালাগুলি অনেকবার পূর্ণ ও শূন্য করা হয়েছে; হারেমের রমণীগণ নিজেদের দেখাবার জন্যে উৎসুক, তারা একটু দরজা খুলে রূপার থালাগুল নিজে নিয়ে যেতে আসে। তাদের অঙ্গুলীপ্রান্ত দেখা যায়, কখনো কখনো একটি চোখ, বা একটি ত্রস্তে অপসারিত বাহু; এ ছাড়া আর কিছু নয়,—তার পরে তুরস্ক ঘড়ির পঞ্চম ঘটিকায় সময় (আন্দাজ বারোটা) হারেমলিকের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, সুন্দরীগণ আর দেখা দেন না।

ইস্মিদের শ্বেত মদিরা, যেটা কোরাণে নিষিদ্ধ নেই, একটিমাত্র গেলাসে দেওয়া হয়, এবং প্রচলিত প্রথানুসারে, সকলে তার থেকে একে একে খায়। ওই মদিরা এত অল্প খাওয়া হয় যে, একটি বালিকাও তার চেয়ে বেশী খেতে পারে, এবং এর কোন ফলাফলও নেই।

অল্পে অল্পে কিন্তু মাথা ভারি হয়ে আসে, এবং ভাবগুল আবছায়া হয়ে হয়ে ক্রমশঃ একটা অনির্দিষ্ট স্বপ্নে মিশিয়ে যায়।

ইজেদ্দিন আলি ও সুলুইমান তাম্বুরীণ হাতে নিয়ে নিদ্রালুস্বরে

* রুষিয়ার সম্রাট।
† রুষীয়।

আসিয়া থেকে, আগত পুরাতন সুরে গান গায়। ঊর্দ্ধগামী ধূম্র, নিমীলিতপ্রায় দৃষ্টি, ঝিক্‌ঝিকে ঝিনুক, গৃহের ঐশ্বর্য্য, সব ক্রমে অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে আসে......তার পরে ধীরে ধীরে মোহ এসে উপস্থিত হয়, সকল মানুষিক বিষয়ের বাঞ্ছিত বিস্মৃতি!

ভৃত্যেরা কতকগুল য়াটাগ * নিয়ে আসে, তার উপর সকলে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ... ... তার পরে সকাল হয়; কাঠের জাফ্‌রি, রঙীণ চিক্‌ ও রেশমের পরদার ভিতর দিয়ে দিনের আলো প্রবেশ লাভ করে।

তখন ইজেদ্দিন-আলির অতিথিগণ প্রত্যেকে একটি শাদা মার্ব্বলের কোটরে প্রসাধনক্রিয়া সমাপন করতে যায়, সেখানে যে তোয়ালে থাকে সেগুলি এত কারুকার্য্য ও জরিখচিত যে, বিলাতে লোকে ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হ'ত। তামার অগ্নিপাত্রের চারিদিকে সমবেত হয়ে সকলে একটি করে সিগারেট খায়, তার পরে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে।

এই জাগরণটা বড় নীরস। যখন সকালবেলা আবার ইস্তাম্বুলের কাদার ভিতর, রাস্তা ও বাজারের হট্টগোলের মধ্যে পড়া যায়, তখন মনে হয় যেন আরব্য উপন্যাসের কোন স্বপ্ন থেকে উঠে আসছি।

ইস্তাম্বুল, ১৯শে মার্চ্চ, ১৮৭৭।

আমাদের এই দেশত্যাগের হুকুম বজ্রাঘাতের মতন আমার উপর এসে পড়েছিল;—"ডীয়র হাউণ্ড"কে † সাউথ্‌হ্যাম্প্‌টনে তলব হয়েছিল। আমি এই আদেশ লঙ্ঘন করে' আরও কিছু

---

* বোধ হয় খাটিয়া গতিকের কিছু হবে।

† লোটির জাহাজের নাম।

ছিল ইস্তাম্বুলে থাকবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলুম; সকল দ্বারেই ধর্না দিয়েছিলুম, এমন কি অটমান সেনাবিভাগের দ্বারেও প্রার্থী হয়েছিলুম, এবং সেটা আর একটু হলেই আমার জন্য উদ্ঘাটিত হ'ত।

উচ্চবংশজাত তুর্কীদের অক্ষুণ্ণ ভদ্রতাসহকারে পাশা আমাকে অতি বিশুদ্ধ ইংরাজি ভাষায় বল্লেন,—"বন্ধু, তোমার কি সেই সঙ্গে ইস্লামের ধর্ম্মও গ্রহণ করবার অভিপ্রায় আছে?"

আমি বল্লুম, "না, খোদাবন্দ; অটমানজাতিভুক্ত হতে, বা নাম ও দেশ বদ্‌লাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু কার্য্যতঃ খৃষ্টানই থাকব।"

তিনি বল্লেন, "তা ভাল, আমি তাই পছন্দ করি; ইস্লামের ধর্ম্মাবলম্বী হওয়া নিতান্ত আবশ্যকীয় নয়, এবং আমরা স্বধর্ম্ম-ভ্রষ্ট লোক ভালবাসিনে। তোমাকে যে অল্পদিনের জন্য কার্য্যে নিযুক্ত করা সম্ভব হবে, তা' আমার বোধ হয় না, তা' ছাড়া তোমার স্বদেশী শাসনকর্ত্তাগণ তাতে অমত করবেন; কিন্তু স্থায়ী রকমে হতেও পারে। আমাদের কাছে থাকতে চাও কি না ভেবে দেখ। আমার মনে হয় যে, আপাততঃ তোমার জাহাজের সঙ্গে যাওয়াই ভাল, কারণ, এ সব বন্দোবস্ত করবার জন্য আমাদের হাতে অল্পই সময় আছে; তাতে ক'রে তুমি এরূপ গুরুতর সংকল্প সম্বন্ধে বিবেচনা করবারও অধিক সময় পাবে, এবং পরে আমাদের কাছে ফিরে আসতে পারবে। তবু, তোমার যদি ইচ্ছা হয় ত আমি আজই সন্ধ্যার সময়ে মহামহিম সুলতানের নিকট তোমার প্রার্থনা জ্ঞাপন করতে পারি, এবং আমার বিশ্বাস করবার সম্পূর্ণ কারণ আছে যে, তিনি তোমার পক্ষেই মত দেবেন।"

আমি বল্লুম, "জনাব, যদি সম্ভব হয় ত এ বিষয়টা অবিলম্বে মীমাংসা হয়ে গেলেই আমি বেশী সন্তুষ্ট হই; আর দেরি হ'লে আপনি আমাকে ভুলে যাবেন। কেবল আমি তার পরে আমার মাকে দেখ্‌তে যাবার জন্য আপনার কাছ থেকে একবার ছুটি নেব।"

তবু আমি এক ঘণ্টার অবসর প্রার্থনা করলুম, এবং বিবেচনা করবার জন্য বাইরে এলুম।

এই ঘণ্টাটা আমার অতি সংক্ষেপ বোধ হ'ল; মিনিটগুলা সেকেণ্ডের মত কেটে যেতে লাগল, এবং আমার মনের মধ্যে নানা কথা তুমুলভাবে তরঙ্গায়িত হ'তে লাগল।

পেরা ও স্কুতুরির মাঝে, টাক্সিমের উচ্চ জমির উপর যে পুরাতন মুসলমান পাড়া বিস্তৃত, তারই রাস্তায় রাস্তায় আমি লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। লোকে আমাকে খুব চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছিল; আমি পরিপাটী ইউরোপীয় পোষাক পরে-ছিলুম। দিনটা অন্ধকার, গরম ও গুমট ছিল;—পুরোনো কাঠের বাড়িগুল, ঘোর ছাই, কালো, ও গেরুয়া রঙের মধ্যে বৈচিত্র্য সাধন করছিল; পাথরবসানো, উথ্‌লো রাস্তার উপর তুর্কী রমণীগণ ছোট ছোট হল্‌দে চটি যুতা পরে বেড়াচ্ছিল, তারা আচক্ষু লাল বা কমলানেবুর রঙের জরিখচিত রেশমী কাপড়ে আবৃত। মাঝে মাঝে শ্বেত সেরালিও ও তার কালো সাইপ্রেসের বাগান, এবং নীলাভ বাষ্পে অর্দ্ধাচ্ছন্ন স্কুটারি ও বস্ফরস্ দেখা যাচ্ছিল।

স্বদেশ ত্যাগ করা, স্বনাম ত্যাগ করাটা যখন দুর্দ্দমনীয় সত্যে পরিণত হয়, এবং যখন এক ঘণ্টার মধ্যেই এ বিষয়ে চির-কালের মত কিছু একটা স্থির করা আবশ্যক হয়ে পড়ে তখন আর বড় সহজ বোধ হয় না। যখন আমি যাবজ্জীবন ইস্তাম্বুলে

আবদ্ধ হব, তখনো কি তাকে ভালবাসব? বিলাত, বিলাতী জীবনের একঘেয়ে চাল, বিরক্তিকর বন্ধুবান্ধব, অকৃতজ্ঞ লোক, সে সব আমি বিনা আপশোষ ও বিনা অনুতাপে পরিত্যাগ করছি। আমি একটা সবিশেষ গুরুতর সঙ্কটের সময়ে এই দেশকে আপনার করছি; এই বসন্তকালেই, যুদ্ধ হয়ে আমাদের উভয়ের অদৃষ্ট নিরূপিত হয়ে যাবে। আমি আরিক্ষ্যুসবাসী হব; আমি যাদের ভালবাসি তাদের দেখতে যাবার জন্য ইংরাজরাজের নৌবিভাগে যতবার ছুটি পেয়ে থাকি, তখনো তাই পাব। * *

এক ঘণ্টার শেষে আমি দৃঢ় ও অটল সংকল্প স্থির করে ফেল্লুম; যাবার কথা মনে করতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। যে গম্ভীর সম্মতিবাচক শব্দে আমি তুরকদেশের সঙ্গে চিরবন্ধনে আবদ্ধ হব, সেইটে উচ্চারণ করতে, এবং সেই দিন সন্ধ্যাবেলাই সুলতানের নিকট আমার যাজ্ঞাজ্ঞাপনের অনুরোধ করতে আমি আবার পাশার দর্শন প্রার্থনা করলুম।

যখন পাশার সম্মুখে এলুম তখন আমার শরীর কাঁপছে বুঝতে পারলুম, এবং আমার চোখের সামনে দিয়ে একটা বাষ্প ভেসে গেল;—আমি বল্লুম "জাঁহাপনা, আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি; আমি সম্মত হতে পারিনে। কেবল অনুগ্রহ করে আমাকে স্মরণ রাখবেন; বিলাতে গিয়ে হয় ত আপনাকে লিখ্‌ব।"

যাঁহারা মানবস্বভাব, বিশেষতঃ পিয়ের লোটির স্বভাব কিছুমাত্র জানেন তাঁহারা এতক্ষণে বুঝিয়া থাকিবেন যে, লোটির যে কেবলমাত্র তুরক দেশটাকে ছাড়িয়া যাইতে এমন হৃদয়বিদারক কষ্ট এবং প্রবল দ্বিধা হইতেছিল তাহা নহে, ইহার মধ্যে আরও

কিছু আছে। কিন্তু আমরা এ পর্যান্ত তাঁহার ডায়ারি হইতে কেবল তুরস্ক ও তুর্কীদের সম্পর্কীয় অংশগুলিই উদ্ধৃত করিয়াছি, তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ করি নাই, সুতরাং এখনো করিব না; বিশেষতঃ যখন সেটা সত্য কি না সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে। এখন হইতে তাঁহার ডায়ারিতে কেবল বিদায়ের আয়োজন এবং ইস্তাম্বুলের সঙ্গে শেষ দেখা-শুনার কথা পাওয়া যায়।

"তার পরে,তখন থেকে সত্যি সত্যি যাবার কথা ভাবতে হ'ল।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায়ই আমি পেরার চক্রটা ঘুরে স্বনাম-লিখিত বিদায়লিপি বাড়িতে বাড়িতে তাড়াতাড়ি রেখে এলুম।

আহম্মদ, ফিট্‌ফাট্ বেশে সজ্জিত হয়ে, আমার ওভারকোট্ বহন করে পিছনে পিছনে আসছিল। সে বলতে লাগল—'লোটি, তুমি আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ, এবং বিদায়-সাক্ষাৎ করে বেড়াচ্ছ; সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু দেখ, যদি সত্যি হয় যে, তুমি আমাদের ভালবাস এবং এরা তোমাকে বিরক্ত করে; যদি সত্যি হয় যে, অন্যদের প্রচলিত নিয়মগুল তোমার পোষায় না, তবে সেগুল ছেড়ে দাও; এই কুশ্রী কালো পোষাক এবং এই অদ্ভুত টুপি ছেড়ে দাও। শীঘ্র আমাদের সঙ্গে ইস্তাম্বুলে এস, এবং এই সব লোককে বিদায় করে দাও।'

আহম্মদের এই কথাগুলির জন্য অনেক লোকের কাছ থেকে আমার বিদায় নেওয়া হ'ল না।

ইস্তাম্বুল, ২০ শে মার্চ্চ, ১৮৭৭।

সামুয়েলের সঙ্গে শেষ ভ্রমণ। আমাদের সময় অত্যন্ত অল্প। নিদারুণ কাল এই শেষ ঘণ্টাগুলি কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, তার পরে

আমরা চিরকালের মতন পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হব। এটা শীতকালের দিন, অন্ধকার ও ঠাণ্ডা, এবং মাঝে মাঝে মার্চ্চের ঝোড়ো বাতাস ব'চ্ছে।

স্থির হয়েছিল যে, আমি বিলাতযাত্রা করবার আগে সামুয়েল জাহাজে করে তার দেশে রওনা হবে। সে শেষ অনুগ্রহস্বরূপ, যতক্ষণ না ইষ্টিমারের বাঁশি বাজে আমার সঙ্গে খোলা গাড়ি করে বেড়াতে চেয়েছিল।

আহম্মদ তার জায়গা দখল করাতে, এবং পরে আমাকে বিলাতে অনুসরণ করবার কথা থাকাতে, সামুয়েলের আরও দুঃখ বেড়েছিল; সে কষ্টে কষ্টে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সামুয়েল বেচারা বুঝতে পারছিল না যে, তার ক্ষুব্ধ ভালবাসা এবং মিহ্রান আহম্মদের স্বচ্ছ ভ্রাতৃসম ভালবাসাতে আকাশপাতাল প্রভেদ; সে বুঝতে পারছিল না যে, সে একটি উত্তাপবর্দ্ধিত গুল্ম যাকে সেখানে, আমার শান্তিময় বাড়িতে রোপণ করা অসম্ভব।

আরাবাজিটা * সজোরে ঘোড়া হাঁকিয়ে আমাদের দ্রুতবেগে নিয়ে যেতে লাগ্‌ল। সামুয়েল পাশার মত আমার লোমের জোব্বায় আচ্ছাদিত, সেটা আমি তাকে দান করেছি; তার সুন্দর মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ও বিষণ্ণ; সে নীরবে দেখছে ইস্তাম্বুলের পাড়াগুলি একে একে আমাদের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে,—তৃণশৈবালসঙ্কুল পরিত্যক্ত বৃহৎ ক্ষেত্রসকল, প্রকাণ্ড মিনারসকল, ধূম্রবর্ণ আকাশের গায়ে শাদা পুরাতন জীর্ণ মস্‌জিদসকল, প্রাচীনতা ও ক্ষয়ের চিহ্নাঙ্কিত পুরাতন সমাধি-মন্দির সকল, যে গুলি ইস্‌লামেরই ন্যায় ভগ্নদশা প্রাপ্ত হচ্ছে।

এই শীতকালের অন্তিম বাতাসস্পর্শে ইস্তাম্বুল ম্লান ও নি-

---

* ভাবে বোধ হয় কোচম্যান হইবে।

জীব; মোল্লাগণ তিনটে বেলার নামাজ পড়চে; এইটেই যাবার সময়।

বেচারা সামুয়েলকে সত্যি সত্যি ভালবাসতুম; কিন্তু ছেলে ভোলাবার জন্য যেমন বলে, আমিও তেমনি করে তাকে বল্লুম যে, আমি তার জন্যেও ফিরে আসব, এবং সালনিকায় তাকে দেখতে যাব; কিন্তু সে বুঝেছিল যে, আর কখনো আমাকে দেখতে পাবে না, তার চখের জল দেখে আমার মনে কষ্ট হতে লাগল।

২৪ শে মার্চ্চ।

একটি বর্ষাদ্র মার্চ্চের সকাল বেলায় এক জন বুড়ো ইহুদী আরিকের গৃহস্থালী তুলে কেলছিল। আহম্মদ বিমর্ষ চক্ষে এই কার্য্য পরিদর্শন করছিল। যে প্রতিবেশীগণ সকালে উঠে তাদের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়েছিল তারা জিজ্ঞাসা করতে লাগল, 'আহাম্মদ তোমার মনিব কোথায় যাচ্ছেন?' আহাম্মদ বল্লে, 'আমি জানিনে'। ভিজে বাক্স, বৃষ্টিজলে সিক্ত বোচ্‌কা, একটা কায়ীকে করে স্বর্ণশৃঙ্গ পার হয়ে সমুদ্রের দিকে যেতে লাগল, কোথায়, তা কেউ জানে না।

তার পরে আরিকের লীলা সম্বরণ হয়ে গেল, সে লোকটার অস্তিত্বই রহিল না।

এই প্রাচ্য স্বপ্ন ত সমস্ত সমাপ্ত হ'ল; আমার জীবনের এই পালাটা,—এই শেষ বোধ হয় যাতে কিছুমাত্র মাধুর্য্য অনুভব করব,—চিরকালের জন্য অতীত হয়ে গেল, এবং কালক্রমে হয় ত তার স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট থাক্‌বে না।

যখন আহাম্মদ আমার এই সব জিনিষপত্র নিয়ে জাহাজে এল, আমি তাকে খবর দিলুম যে, আমাদের যাওয়াটা নিদেন চব্বিশ ঘণ্টা পিছিয়ে গেছে। মর্ম্মরা সমুদ্রের দিকে ঝড়ের লক্ষণ

দেখা দিয়েছিল। আমি বল্লুম,—'চল আর একবার ইস্তাম্বুলে ঘুরে আসি; তাতে মরণাতীত ভ্রমণের মত এক প্রকার বিষাদের সৌন্দর্য্য থাকবে।'

আমি আগে যেখানে নিয়মিত বেশ পরিবর্ত্তন করতুম সেখানে গিয়ে য়ুরোপীয় পোষাক ত্যাগ করলুম, তার পরে যে গোঁড়া মুসলমানগণ অকৃত্রিম বিশ্বাসপূর্ব্বক ভক্তিভরে নমাজ পড়তে যায়, তাদের মত গম্ভীরভাবে ও দস্তুরমত বেশে আরিফ্‌এফেন্দি স্বয়ং আর একবার সেই কোটর থেকে বেরিয়ে, জপমালা হাতে করে' সাঁকো পার হ'লেন। আহম্মদ তার সর্ব্বোত্তম বস্ত্র পরিধান করে তাঁর পাশে পাশে চলতে লাগল। এই শেষদিনের কার্য্যতালিকা সে নিজে নিয়মিত করবার অনুমতি চেয়েছিল, এবং আপাততঃ নীরব দুঃখে মগ্ন ছিল।

ইস্তাম্বুলের সব সুপরিচিত স্থানে বেড়ানো, অনেকগুল নার-গিলে খাওয়া, এবং সব মস্‌জিদে থামা হয়ে গেলে পর আমরা সন্ধ্যাবেলায় আবার আয়ুবে এসে উপস্থিত হলুম; সেই স্থানে আর একবার এসে পরলুম, যেখানে এখন আমি কেবলমাত্র একজন আলয়হীন বেদেশী ব্যক্তি, যার স্মৃতিও শীঘ্র বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

আমি সুলুইমানের কফিশালায় প্রবেশ করাতে একটা আলোড়ন উপস্থিত হ'ল, সকলে আমাকে চিরদিনের মত অন্ত-র্হিত ও নির্ব্বাসিত মনে করেছিল। আজ সন্ধ্যাবেলা সেখানে নানারকমের বহুসংখ্যক লোক সম্মিলিত হয়েছে; অনেকগুল সম্পূর্ণ নূতন মুখ, কোথা থেকে এসেছে কে জানে। * *। আহম্মদ আমার জন্য একটি বিদায়-উৎসবের আয়োজন করে' তাতে এই সকল লোককে নিমন্ত্রণ করলে। সে একটি নহ-

যন্ত্রেরও যোগাড় করলে ;—সাপুড়ের বাঁশির মত তীব্রস্বর দুটো বাদ্যযন্ত্র, একটা আর্গিন ও একটা বড় ঢোল। আমি এই সব উদ্যোগে রাজি হলুম কেবল এই অঙ্গীকারে যে, কিছু ভাঙ্গা হবে না, ও রক্তপাত দেখতে হবে না।

আজ সন্ধ্যাবেলা আমরা নিজেদের চেতনাশূন্য করে' ফেলবার চেষ্টায় আছি ; তা ভালই, আমি ত আর কিছু চাইনে।

আমাকে আমার নারগিলেটা এনে দিলে, এবং একটি তুরস্ক কফির পেয়ালা, সেটা প্রত্যেক পনেরো মিনিট অন্তর ভরে' দেবার ভার একটি ছেলের উপর রইল, তার পরে আহম্মদ উপস্থিত সকলের হাত ধরাধরি করে' চক্রাকারে সাজিয়ে তাদের নাচতে বল্লে।

কণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোকে অদ্ভুত মনুষ্যাকারের এক দীর্ঘ শ্রেণী আমার সামনে আন্দোলিত হতে লাগল ; বধিরকারী বাদ্যে গৃহের কড়িবরগা কেঁপে কেঁপে উঠছে, মলিন দেয়ালে টাঙ্গানো পিত্তলের বাসন আঘাত পেয়ে ঝণ্‌ঝণ্‌ শব্দ করছে ; নহবৎ থেকে তার স্বর নিঃসৃত হচ্ছে, এবং তুরস্ক বাদ্যের হৃদয়বিদারক আমোদস্রোত মত্তভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। এক ঘন্টার মধ্যে সকলে নৃত্য ও শব্দে বিহ্বল হয়ে পড়ল ; এইবার উৎসবটা মনের মতন হয়ে দাঁড়াল।

আমিও যেন কেবল একটা বাষ্পাবরণের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলুম, আমার মস্তিক অদ্ভুত অসংলগ্নভাবে পরিপূর্ণ হচ্ছিল। শ্রান্ত ও উর্দ্ধশ্বাস লোকের দল আবছায়া আলোকে যাতায়াত করতে লাগল। নৃত্যটা অবিরাম তরঙ্গায়িত হতে লাগল, এবং প্রত্যেক ঘূর্ণীর পর আহম্মদ হাতের পিছন দিক দিয়ে একটা করে সার্সি ভাঙ্গতে লাগল। একে একে গৃহের সব সার্সি মাটিতে

পড়ে গিয়ে নর্ত্তকদের পদতলে চূর্ণ হয়ে গেল; আহম্মদের ক্ষত-বিক্ষত হাত থেকে কাঠের মেজে রক্তময় হয়ে গেল। * *

তুরস্কীয় শোকে বুঝি গোলমাল আর রক্তারক্তি না হলে চলে না।

এই উৎসব দেখে আমার ঘৃণা ধরে গেল, এবং আহম্মদকে এরূপ বিবেচনাশূন্য কাজে প্রবৃত্ত ও প্রতিজ্ঞারক্ষায় এত শিথিল দেখে তার ভবিষ্যতের জন্য ভাবনা হ'তে লাগল।

আমি উঠে প্রস্থানোদ্যত হলুম; আহম্মদ বুঝতে পেরে নীরবে আমাকে অনুসরণ করলে। বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাসে আমরা শান্ত ও প্রকৃতিস্থ হলুম।

আহম্মদ জিজ্ঞাসা করলে,—'লোটি, তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

আমি বল্লুম, 'জাহাজে; আমি আর তোমাকে চিনিনে; তুমি আজ সন্ধ্যাবেলায় যেরূপ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছ, আমিও সেইরূপ করব, তুমি আর কখনো আমাকে দেখতে পাবে না।' ব'লে আমি আর একটু দূরে গিয়ে একজন বিলম্বাগত মাঝির সঙ্গে গালাটা যাবার নৌকাভাড়া নিয়ে দরদাম করতে লাগলুম।

আহম্মদ বল্লে, 'লোটি, আমাকে মাপ কর, তুমি এরকম করে তোমার ভাইকে কখনো ছেড়ে যেতে পারবে না!' সে কাঁদতে কাঁদতে আমাকে মিনতি করতে লাগল। না, আমারও তাকে এরকম করে' ত্যাগ করবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল যে, তার একটু শিক্ষা ও প্রায়শ্চিত্ত দরকার, তাই অবিচলিত রইলুম।

তখন সে তার রক্তময় হাতে আমাকে ধরে রাখতে চেষ্টা করলে, ও হতাশভাবে আমাকে আঁকড়ে ধরলে। আমি তাকে সজোরে ঠেলে দিয়ে একটা কাঠস্তূপের উপর ছিট্‌কে ফেল্লুম,

সেটা সশব্দে ভেঙ্গে পড়ল। রাত্রের বাসি-বজুক (প্রহরীগণ) কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, তারা আমাদের বদ্‌মায়েশে ঠাউরে লণ্ঠন নিয়ে কাছে এল। আমরা জলের ধারে, সহরতলির একটি নির্জ্জন স্থানে, ইস্তাম্বুলের প্রাচীর থেকে দূরে ছিলুম, এবং এই লাল হাত দুষ্কর্ম্মের পরিচয় দিচ্ছিল।

আমি বল্লুম,—'কিছু হয়নি; কেবল এই ছেলেটা মদ খেয়েছে, আমি তাকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।' বলে' আহম্মদের হাত ধরে' আমি তাকে তার ভগ্নী এরিক্‌নাজের বাড়িতে নিয়ে গেলুম, সে তার ক্ষত বেঁধে দিয়ে, একটা লম্বা বক্তৃতা দিয়ে তাকে শুতে পাঠিয়ে দিলে।

এরিক্‌নাজ হালুমের চেহারায় একটা মনোহর ও সবিশেষ কুশ্রীতা আছে, তার রঙ্ মোমের মত শাদা, এবং ভ্রূ কাক্‌পক্ষের মত কালো। সে ফ্র্যাঙ্ক রমণীদের ন্যায় খোলা মাথায় আমাদের অভ্যর্থনা করলে। তার বাড়ির ভিতরের সবই শৃঙ্খলা, স্বচ্ছলতা, ও নিখুঁৎ পরিচ্ছন্নতার পরিচয় দিচ্ছিল। তার দুই বন্ধু মুরা ও ফেন্‌জিলে তার সঙ্গে বসে' ছিল, আমরা আসাতে তারা ঘোম্‌টা দিয়ে পালাল। তারা ছোট ছোট লাল নাগরা চটি যুতার উপর চুম্‌কি বসানোতে নিযুক্ত ছিল।

আমার বন্ধু আলেম্‌শা, এরিক্‌নাজের কন্যা ও আহম্মদের ভাগিনী, এসে আমার কোলের উপর তার অভ্যস্ত জায়গা দখল করে' ঘুমিয়ে পড়ল; সে একটি তিন বছরের ছোট সুন্দর মেয়ে, বড় বড় কুচ্‌কুচে কাল চোখ আছে, এবং পুতুলের মত পুট্‌পুটে ও পরিষ্কার।

কফি ও সিগারেট খাওয়া হ'য়ে গেলে পর আমাদের জন্যে দুটো শাদা গদি, দুটো শাদা য়াটাগ, ও দুটো শাদা গাত্রবস্ত্র আনা হ'ল, সব বরফের মত ধব্‌ধবে; এরিক্‌নাজ ও আলেম্‌শা আমাদের "শুভ রাত্রি" ব'লে শুতে গেল, এবং আমরা দুজনে গভীর নিদ্রায় রাত কাটালুম।

উজ্জ্বল রৌদ্র এসে আমাদের খুব সকালে উঠিয়ে দিলে, এবং আমরা স্বর্ণশৃঙ্গের অভিমুখী ছোট ছোট রাস্তা দিয়ে তাড়াতাড়ি

নেমে গেলুম। একটি কায়ীক সেথানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

'প্রি-পাশার রাশি রাশি কালো বাড়ি ঐ উচ্চে স্তূপাকৃত হ'য়ে সোনালী রৌদ্রে ভাসছে, ও সব সার্সি চিক্‌চিক্ করছে। এরিক্‌নাজ ও আলেমশা লাল কাপড় পরে,' সূর্য্যোদয়ে তাদের বাড়ির ছাতে চড়ে বসে' দূর থেকে আমাদের যাওয়া দেখ্‌ছে।

ঐ আয়ুব গেল, ঐ সুলইমানের কফিশালা, মস্‌জিদের ক্ষুদ্র ক্ষেত্র, এবং প্রভাতের পূর্ণ আলোকবিভাসিত আরিফ এফেন্দির গৃহ। জলের ধারে কেউ নেই; সব এখনো বন্ধদ্বার ও ঘুমন্ত। আমার বাড়িটিকে আমি কতবার বরফে ও উত্তরে বাতাসে অন্ধকার ও ম্লান দেখেছি, কিন্তু শেষ ছবিস্বরূপ তাকে সূর্য্যকিরণে ঝলসিত দেখে গেলুম। এই শেষ সূর্য্যোদয়টি অসাধারণ উজ্জ্বল হয়েছে; স্বর্ণশৃঙ্গ বরাবর, আয়ুব থেকে সেরালিও পর্য্যন্ত, গম্বুজ ও মিনারগুলি স্বচ্ছ আকাশের গায়ে গোলাপী বা রামধনুর আভায় অঙ্কিত রয়েছে। ঘোমটাচ্ছন্ন রমণী বা সুবেশী যাত্রী বহন করে' শত শত সোনালী কায়ীক ভাস্‌তে আরম্ভ করেছে।

আমরা এক ঘণ্টার মধ্যে জাহাজে এসে পড়লুম। সেখানে সব ওলট্‌পালট্,—এবার সত্যই যাওয়া হবে। যাত্রার সময় বেলা দুপুর ঠিক করা হয়েছে।

আহম্মদ বল্লে,—'চল লোটি; চল আর একবার ইস্তাম্বুলে গিয়ে শেষবার দুজনে একত্র বসে নারগিলে খাই।'

আমরা দৌড়ে দৌড়ে সালিবাজার, টপ-হানে ও গালাটা পার হয়ে ইস্তাম্বুলের সাঁকোতে এসে উপস্থিত হলুম।

জলন্ত রৌদ্রে লোকের ভীড় তাড়াতাড়ি চলেছে; আমি যেমনি চলে যাচ্ছি, অমনি বাস্তবিক বসন্তকাল স্থায়ীরূপে এসে উপনীত হল। ঐ উচ্চে ইস্তাম্বুলের মুকুটস্বরূপ প্রাচীর, গম্বুজ, ও মিনাররাজির উপর এই মধ্যাহ্নের প্রখর আলোক বর্ষিত হচ্ছে; রামধনুর উজ্জ্বলতম রঙের বস্ত্র পরিহিত এক বিচিত্র রঙীন্ জনতার উপরও সেই আলো বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে। সুদর্শন যাত্রীসাধারণ বহন করে' নৌকা আসছে যাচ্ছে; হকারগণ ভীড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে প্রাণপণ চীৎকার করছে। এই

নৌকাগুলি আমাদের বন্দরদের সকল স্থানেই নিয়ে গেছে, আমরা সবগুলিকেই চিনি; আমরা ইস্তাম্বুলের সাঁকোর উপরকার সব দোকান, সব যাত্রী, এমন কি, সব ভিক্ষুকদের চিনি,—যত কাণা, খোঁড়া, নুলো, গলাকাটা ও ঠুঁটোর সম্পূর্ণ সঙ্কলন। আজ তুরস্ক ভিখারী সম্প্রদায়ের সকলেই বাইরে এসেছে; আমি সবাইকে ভিক্ষা বিতরণ করলুম, এবং এক গঙ্গা আশীর্ব্বাদ ও সেলাম উপার্জ্জন করলুম। আমরা ইস্তাম্বুলে, জেনি-জামির বৃহৎ ক্ষেত্রে মস্‌জিদের সমনে থামলুম। আমার জীবনে এই শেষবার, তুর্কী হবার সুখ,—আমার বন্ধু আহম্মদের পাশে বসে এই প্রাচ্য চিত্রের মধ্যে নারগিলে খাবার সুখ অনুভব করলুম।

আজ প্রকৃত বাসন্তী উৎসব হয়েছে,—পরিচ্ছদ ও রঙের এক প্রদর্শনীবিশেষ। সকলেই বাইরে এসে বসে আছে, প্লেনবৃক্ষতলায়, মার্ব্বলের ফোয়ারার চতুর্দ্দিকে, আঙুরলতার জাফ্‌রির নীচে,—সেটা শীঘ্রই নব কিশলয়ে ছেয়ে যাবে। নাপিতগণ রাস্তায় তাদের আড্ডা স্থাপন করেছে, এবং খোলা বাতাসে কাজ চালাচ্ছে; গোঁড়া মুসলমানগণ গম্ভীরভাবে মাথা কামিয়ে নিচ্ছে, কেবল উপরে একটি টিকি রেখে দিচ্ছে, সেটা ধরে' মহম্মদ তাদের স্বর্গে তুলে নিয়ে যাবেন।

আমাকে কি কেউ কোনরূপ স্বর্গে নিয়ে যাবে না?—এই শ্রান্তিকর বিরক্তিকর জরাজীর্ণ পৃথিবী ছাড়া আর কোন জায়গায়, যেখানে কিছুই বদলাবে না, যেখানে আমি যা ভালবাসি কিম্বা বেসেছি তার থেকে ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হব না?—কেউ যদি কেবল আমাকে মুসলমান ধর্ম্মে বিশ্বাস দিতে পারে, তাহলে আমি কি আনন্দাশ্রুসহকারে প্রেরিতপুরুষের সবুজ নিশান আলিঙ্গন করি! ... ...

টিকির প্রসঙ্গে কি যে অসঙ্গত কথা এনে ফেল্লুম তার ঠিক নেই ... ...

মোল্লাগণ তাদের মিনারে উঠ্‌ছে, দ্বিপ্রহরের নমাজের কাল উপস্থিত; আমার যাবার সময় হয়েছে। * * *

আহম্মদ আমার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজে এল, সেখানে দেখা-

সাক্ষাৎ ও জাহাজ ছাড়বার হট্টগোলের মধ্যে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলুম।

আমরা চল্লুম,—ইস্তাম্বুল ক্রমশঃ দূরে অপসারিত হচ্ছে।"......

এইখানেই পিয়ের লোটির ডায়ারির সহিত আমাদের সম্বন্ধ একপ্রকার সমাপ্ত, যদিও তাঁহার বইখানি এখনো শেষ হয় নাই। ইহার পরে আর একটি ভাগে লোটির তুরস্কে প্রত্যাবর্ত্তন, বন্ধুদের সহিত অদর্শনজনিত দুঃখ এবং অবশেষে যুদ্ধে মৃত্যুর কথা লেখা আছে, কিন্তু সেটা কেমন পূর্ব্বাংশের সহিত মিশ খায় না, এবং তাহাতে সুন্দর বা নূতন কথাও কিছু নাই। তিনি বলেন, তাঁহার চিরকালই এইরূপ হয়, কোন অপরিচিত মনোরম দেশে যাওয়া, সেখানে দু একটি লোকের সঙ্গে মিলে মিশে থেকে তাদের মায়াপাশে জড়িত এবং দেশটির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হওয়া, তাহার পরে কতকগুলি স্মৃতিচিহ্ন বহন করিয়া কাঁদিয়ে ও কেঁদে চলে আসা। কে জানে তাঁহার এই সকল কাহিনীতে মানুষিক অংশ কতদূর সত্য এবং তাঁহার মজ্জাগত বিষাদ ও নিরাশাপ্রসূত চিন্তা ও ভাবপাঠ মনের পক্ষে কতদূর স্বাস্থ্যকর, কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ লেখা ও বর্ণনার খুব একটা মধুর আকর্ষণী শক্তি আছে সন্দেহ নাই; সে গুলি পাড়লে সেই সেই দেশ ও লোকের সঙ্গে বাস্তবিক ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করা যায়, এবং সকল প্রাণীর প্রতি তাঁহার আন্তরিক মমতা ও দয়া দেখিয়া আশ্চর্য্য ও মোহিত হইতে হয়। সমালোচকগণ বলেন ইনিই প্রথমে ফরাসী সাহিত্যে সুদূর বিদেশের উদার চিত্রপট উন্মুক্ত করিয়া দেন, তা' না হইলে পূর্ব্বে লেখকগণ বড়ই কেন্দ্রগত, পারিসভক্ত, ও আপনার ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে ভালবাসিতেন; সেই জন্যই হয় ত লোটির আজকাল এত প্রভাব, এবং খুব সম্ভব সে প্রভাব স্থায়ীও হইবে।

সাধনা।

কর্ত্তব্যনীতি। *

(অধ্যাপক হক্স্‌লির মত।)

জগতে দেখা যায় সুখ দুঃখ প্রাণীদের মধ্যে ঠিক ন্যায় বিচার-মতে বণ্টন হয় না। প্রথমতঃ নিম্নশ্রেণীয় প্রাণীদের এতটুকু বিবেকবুদ্ধি নাই যাহাতে তাহারা দণ্ড পুরস্কারের স্বরূপ সুখ-দুঃখের অধিকারী হইতে পারে। তাহার পরে মানুষের মধ্যেও দেখিতে পাই পাপাচরণ করিয়াও কত লোক উন্নতি লাভ করিতেছে এবং পুণ্যবান দ্বারে দ্বারে অন্ন ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে; পিতার দোষে পুত্র কষ্টভোগ করিতেছে; অজ্ঞানকৃত কার্য্যের ফল ইচ্ছাকৃত অপরাধের সমান হইয়া দাঁড়াইতেছে; এবং একজন লোকের উৎপীড়ন বা অবিবেচনায় শত সহস্র লোককে দুঃখ বহন করিতে হইতেছে।

অতএব জগতের নিয়মকে ধর্ম্মনীতির আইন অনুসারে বিচার করিতে হইলে তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে হয়। কিন্তু সাহস করিয়া কোন বিচারক সে রায় প্রকাশ করিতে চান না। হিব্রুশাস্ত্র এসম্বন্ধে চুপ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ এবং

---

* Evolution and Ethics. By Thomas H. Huxley, F. R. S.

গ্রীস্ আসামীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া ওকালতী করিতে চেষ্টা করেন।

ভারতবর্ষ বলেন, সকলকেই অসংখ্য পূর্ব্বজন্মপরম্পরায় কর্ম্ম-ফল ভোগ করিতে হয়। বিশ্বনিয়মে কোথাও কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলের ছেদ নাই; সুখদুঃখও সেই অনন্ত অমোঘ অবিচ্ছিন্ন নিয়মের বশবর্ত্তী।

হিন্দুশাস্ত্রমতে পরিবর্ত্তমান বস্তু এবং মনঃপদার্থের অভ্যন্তরে একটি নিত্য সত্তা আছে। জগতের মধ্যবর্ত্তী সেই নিত্যপদার্থের নাম ব্রহ্ম এবং জীবের অন্তরস্থিত ধ্রুব সত্তাকে আত্মা কহে। জীবাত্মা কেবল ইন্দ্রিয়জ্ঞান বুদ্ধিবাসনা প্রভৃতি মায়াদ্বারা ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। যাহারা অজ্ঞান তাহারা এই মায়া-কেই সত্য বলিয়া জানে এবং সেই ভ্রমবশতই বাসনাপাশে বদ্ধ হইয়া দুঃখের কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইতে থাকে।

এ মত গ্রহণ করিলে অস্তিত্ব হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টাই এক-মাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। বিষয়বাসনা, সমাজবন্ধন, পারি-বারিক স্নেহপ্রেম, এমন কি, ক্ষুধাতৃষ্ণা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিও বিনাশ করিয়া একপ্রকার সংজ্ঞাহীন জড়ত্বকেই ব্রহ্মসম্মিলনের লক্ষণ বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়।

বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণদিগের এই মত গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন না; তাঁহারা আত্মা এবং ব্রহ্মের সত্তাও লোপ করিয়া দিলেন। কারণ, কোথাও কোনো অস্তিত্বের লেশমাত্রও স্বীকার করিলে পুনরায় তাহা হইতে দুঃখের অভিব্যক্তি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মানিতে হয়। এমন কি, হিন্দুশাস্ত্রের নির্গুণ ব্রহ্মের মত এমন একটা নাস্তিবাচক অস্তিত্বকেও তাঁহারা কোথাও স্থান দিতে সাহস করিলেন না।

বুদ্ধ বলিলেন, বস্তুই বা কি, আর মনই বা কি, কিছুর মধ্যেই

নিত্যপদার্থ নাই; অনন্ত বিশ্বমরীচিকা কেবল স্বপ্নপ্রবাহমাত্র। স্বপ্ন দেখিবার বাসনা একবার ধ্বংস করিতে পারিলেই মানুষের মুক্তি হয়—এবং ব্রহ্ম ও আত্মা নামক কোন নিত্যপদার্থ না থাকাতে একবার নির্ব্বাণলাভ করিলে আর দ্বিতীয়বার অস্তিত্ব-লাভের সম্ভাবনামাত্র থাকে না।

প্রাচীন গ্রীসে ষ্টোয়িক-সম্প্রদায় যখন জগৎকারণ ঈশ্বরে অসীম সদ্‌গুণের আরোপ করিলেন তখন তাঁহার সৃষ্ট বিশ্বজগতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব হইল, ইহাই এক সমস্যা দাঁড়াইল।

তাঁহারা বলিলেন, প্রথমতঃ জগতে অমঙ্গল নাই; দ্বিতীয়তঃ যদি বা থাকে তাহা মঙ্গলেরই আনুষঙ্গিক; এবং যেটুকু আছে তাহা, হয় আমাদের নিজদোষে, নয় আমাদের ভালরই জন্য।

হক্স্‌লি বলেন, অমঙ্গলের মধ্যেও যে, মঙ্গলের অস্তিত্ব দেখা যায় তাহাতে সন্দেহ নাই এবং দুঃখকষ্ট যে, অনেক সময় আমাদের শিক্ষকের কার্য্য করে তাহাও সত্য; কিন্তু অসংখ্য মূঢ় প্রাণী—যাহারা এই শিক্ষায় কোন উপকার পায় না এবং যাহাদিগকে কোন কাজের জন্য দায়িক করা যাইতে পারে না, তাহারা যে কেন দুঃখভোগ করে, এবং অনন্ত শক্তিমান্ কেনই বা সর্ব্বতোভাবে দুঃখপাপহীন করিয়া জগৎ সৃজন না করিলেন ষ্টোয়িকগণ তাহার কোন উত্তর দিলেন না। জগতে যাহা কিছু আছে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম একথা স্বীকার করিলে কোথাও কোনরূপ সংশোধনের চেষ্টা না করিয়া সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকাই কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু বাহ্যজগৎ যে, মানুষের ধর্ম্মশিক্ষাস্থল, সর্ব্বমঙ্গলবাদী ষ্টোয়িকদের নিকটও তাহা ক্রমশঃ অপ্রমাণ হইতে লাগিল।

কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, এক হিসাবে জগৎপ্রকৃতি আমাদের ধর্ম্মপ্রকৃতির বিরোধী। এ সম্বন্ধে হক্স্‌লির মত আর একটু বিবৃত করিয়া নিম্নে লিখা যাইতেছে।

মানুষ জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়া আজ সমস্ত জীবরাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠপদে অভিষিক্ত হইয়াছে। নিজেকে যেন-তেন প্রকারেণ বজায় রাখা, যাহা পাওয়া যায় নির্ব্বিচারে তাহাকে আত্মসাৎ করা, এবং যাহা হাতে আসে তাহাকে একান্ত চেষ্টায় রক্ষা করা, ইহাই জীবনযুদ্ধের প্রধান অঙ্গ। যে সকল গুণের প্রভাবে বানর এবং ব্যাঘ্র জীবনরক্ষা করিতেছে সেই সকল গুণ লইয়াই মানুষ জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহার শারীরপ্রকৃতির বিশেষত্ব, তাহার ধূর্ত্ততা, তাহার সামাজিকতা, তাহার কৌতূহল, তাহার অনুকরণনৈপুণ্য, এবং তাহার ইচ্ছা বাধা প্রাপ্ত হইলে প্রচণ্ড ক্রোধাবেগে নিষ্ঠুর হিংস্রতাই তাহাকে জীবন-রঙ্গভূমিতে বিজয়ী করিয়াছে।

ক্রমে আদিম অরাজকতা দূর হইয়া যতই সামাজিক শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল ততই মনুষ্যের পাশবগুণগুলি দোষের হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। সভ্য মানব যে মই দিয়া উপরে উঠিয়াছে সে মইটা আজ পদাঘাত করিয়া ফেলিয়া দিতে চাহে। ভিতরে ব্যাঘ্র এবং বানরের যে অংশটা আছে সেটাকে দূর করিতে পারিলে বাঁচে। কিন্তু সেই ব্যাঘ্র বানরটা সভ্য মানবের সুবিধা বুঝিয়া দূরে যাইতে সম্মত হয় না; সেই কৈশোরের চির-সহচরগুলি অনাদৃত হইয়াও মানবসমাজের মধ্যে অনাহূত আসিয়া পড়ে এবং আমাদের সংযত সামাজিক জীবনে শত সহস্র দুঃখ-কষ্ট এবং জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। সেই সনাতন ব্যাঘ্রবানর প্রবৃত্তিগুলাকে মানুষ আজ পাপ বলিয়া দাগা দিয়াছে এবং

যাহারা এককালে আমাদিগকে দুরূহ ভবসংগ্রামে উত্তীর্ণ করিয়াছে তাহাদিগকে বন্ধনে ছেদনে সবংশে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

অতএব জগৎপ্রকৃতি আমাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আনুকূল্য করিতেছে একথা স্বীকার করা যায় না; বরঞ্চ দেখা যায় আমাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সহিত তাহার অহর্নিশি সংগ্রাম চলিতেছে। ষ্টোয়িকগণও তাহা বুঝিলেন, এবং অবশেষে বলিলেন—সংসার ত্যাগ করিয়া, সমস্ত মায়ামমতা বিসর্জ্জন দিয়া তবে কিয়ৎ পরিমাণে পরিপূর্ণতার আদর্শ লাভ করা যাইতে পারে। Apatheia অর্থাৎ বৈরাগ্য, মানবপ্রকৃতির পূর্ণতাসাধনের উপায়; সেই বৈরাগ্যের অবস্থায় মানবহৃদয়ের সমস্ত ইচ্ছা কেবল বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার অনুশাসন পালন করিয়া চলে। সেই স্বল্পাবশিষ্ট চেষ্টাটুকুও কেবল অল্পদিনের জন্য;—সে যেন বিশ্বব্যাপী পরমাত্মারই দেহপিঞ্জরাবদ্ধ একটি উচ্ছ্বাস মৃত্যু-অন্তে সেই সর্ব্বব্যাপী আত্মার সহিত পুনর্ম্মিলনের প্রয়াস পাইতেছে।

দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষ এবং গ্রীস ভিন্ন দিক হইতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে এক বৈরাগ্যে গিয়া মিলিত হইয়াছে।

বৈদিক এবং হোমেরিক কাব্যে আমাদের সম্মুখে যে জীবনের চিত্র ধরিয়াছে তাহার মধ্যে কি একটা বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য এবং আনন্দপূর্ণ সমরোৎসাহ দেখা যায়—তখন বীরগণ সুখদুঃখ, শুভদিনের সূর্য্যালোক এবং দুর্দ্দিনের বজ্রপতন উভয়কেই খেলাচ্ছলে গ্রহণ করিতেন এবং যখন শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিত তখন দেবতাদের সহিত যুদ্ধ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তাহার পরে কএক শতাব্দী অতীত হইতেই পরিণত সভ্যতাপ্রভাবে চিন্তাজ্বরে জরাজীর্ণ হইয়া সেই বীরমণ্ডলীর উত্তরপুরুষগণ জগৎ সংসারকে

দুঃখময় দেখিতে লাগিল। যোদ্ধা হইল তপস্বী, কর্ম্মী হইল বৈরাগী। গঙ্গাকূলে এবং টাইবরতীরে নীতিজ্ঞ ব্যক্তি স্বীকার করিলেন বিশ্বসংসার প্রবল শত্রু এবং বিশ্ববন্ধনচ্ছেদনই মুক্তির প্রধান উপায়।

প্রাচীন হিন্দু ও গ্রীক দর্শন যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছিল আধুনিক মানব মনও সেইখান হইতেই যাত্রার উপক্রম করিতেছে।

কিন্তু আধুনিক সমাজে যদিও দুঃখবাদী ও সুখবাদীর অভাব নাই তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হয় আমাদের অধিকাংশ লোকই দুই মতের মাঝখান দিয়া চলিয়া থাকেন। মোটের উপর সাধারণের ধারণা জগৎটা নিতান্ত সুখেরও নহে, নিতান্ত দুঃখেরও নহে।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষ যে, নিজকৃত কর্ম্মের দ্বারা জীবনের সুখ-দুঃখের অনেকটা হ্রাসবৃদ্ধি সাধন করিতে পারে এ সম্বন্ধেও অধিকাংশের মতের ঐক্য আছে।

তৃতীয়তঃ, কায়মনোবাক্যে সমাজের মঙ্গলসাধন যে, আমাদের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য এ সম্বন্ধেও লেখক কাহাকেও সন্দেহ প্রকাশ করিতে শোনেন নাই।

এক্ষণে, বর্ত্তমানকালে প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের যে সকল নূতন জ্ঞানলাভ হইয়াছে তাহার সহিত আমাদের কর্ত্তব্যনীতির কতটা যোগ তাহাই আলোচ্য।

একদল আছেন যাঁহারা অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনার ন্যায় ধর্ম্মনীতিরও ক্রমাভিব্যক্তি স্বীকার করেন। লেখকের সহিত তাঁহাদের মতের বিশেষ অনৈক্য নাই, কিন্তু হক্স্‌লি বলেন, আমাদের ভালমন্দ প্রবৃত্তিগুলি কিরূপে পরিব্যক্ত হইল অভি-

ব্যক্তিবাদ তাহা আমাদিগকে জানাইতে পারে কিন্তু ভাল যে মন্দের অপেক্ষা কেন শ্রেয়ঃ অভিব্যক্তি-তত্ত্ব তাহার কোন নূতন সদ্‌যুক্তি দেখাইতে পারে না। হয় ত কোন একদিন, আমাদের সৌন্দর্য্যবোধের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে আমরা জ্ঞান-লাভ করিতে পারিব কিন্তু তাহাতে করিয়া, এটা সুন্দর এবং ওটা কুৎসিত, এই বোধশক্তির কোন হ্রাসবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিবে না।

ধর্ম্মনীতির অভিব্যক্তিবাদ উপলক্ষে আর একটা ভ্রম আজ-কাল প্রচলিত হইতে দেখা যায়। মোটের উপরে জীবজন্তু উদ্ভিদ্‌গণ জীবনযুদ্ধে যোগ্যতমতা অনুসারেই টিঁকিয়া গিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছে ; অতএব সামাজিক মনুষ্য, নীতিপথবর্ত্তী মনুষ্যও সেই এক উপায়েই উন্নতিসোপানে অগ্রসর হইতে পারে এমন কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। যোগ্যতম এবং সাধুতম কথাটা এক নহে। প্রকৃতিতে যোগ্যতমতা অবস্থার উপরে নির্ভর করে। পৃথিবী যদি অধিকতর শীতল হইয়া আসে তবে ওক অপেক্ষা শৈবাল যোগ্যতর হইয়া দাঁড়াইবে, সে স্থলে অন্য কোন-রূপ শ্রেষ্ঠতাকে যোগ্যতা বলা যাইবে না।

সামাজিক মনুষ্যও এই জাগতিক নিয়মের অধীন তাহাতে সন্দেহ নাই। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে এবং জীবিকার জন্য প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে—যাহার জোর বেশি, আপনাকে বেশি জাহির করিতে পারে সে অক্ষমকে দলিত করিয়া দিতেছে। কিন্তু তথাপি অভিব্যক্তির এই জাগতিক পদ্ধতি সভ্যতার নিম্না-বস্থাতেই অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। সামাজিক উন্নতির অর্থই, এই জাগতিক পদ্ধতিকে পদে পদে বাধা দিয়া তৎপরিবর্ত্তে নূতন পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করা—যাহাকে বলে নৈতিক পদ্ধতি ;